রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উদ্যোগে

‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশান ডে’ প্রতিপালিত

বিগত ১৬ অক্টোবর ছুটির পর কর্মচারীভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে ডব্লু এফ টি ইউ-র নির্ধারিত কর্মসূচী হিসাবে “ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশান ডে” সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে বিশ্বের বিভিন্ন জ্বলন্ত সমস্যাকে বিষয় হিসাবে নির্ধারিত করে ডব্লু এফ টি ইউ-র উদ্যোগে সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবছর ৩ অক্টোবর এই কর্মসূচী প্রতিপালিত হয়। বিশ্বের প্রতিটি দেশের সাথে সাথে ভারতেও শ্রমিক কর্মচারীরা ঐ দিনে এই কর্মসূচী প্রতিপালন করে। সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের আহ্বানে বিভিন্ন রাজ্যের কর্মচারী সমাজও এই কর্মসূচীতে সামিল হয় প্রতিবছর। পশ্চিমবঙ্গে এবছর ৩ অক্টোবর অনিবার্য কারণে ঐ কর্মসূচী প্রতিপালন করা যায় নি। তাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বানে ১৬ অক্টোবর এই বছরের বিষয় ‘কর্মসংস্থানহীনতা” (আনএমপ্লয়মেন্ট)-কে সামনে রেখে কর্মচারীদের ভিড়ে ঠাসা অরবিন্দ সভাকক্ষে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। মূল বক্তা ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও রাজ্যের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত।

ড. অসীম দাশগুপ্ত

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অশোক পাত্র। ড. অসীম দাশগুপ্তকে পুষ্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মনোজ কান্তি গুহ। এরপর প্রারম্ভিক বক্তব্যে সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, বিগত ১২, ১৩ সেপ্টেম্বর সারাভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় পশ্চিমবঙ্গ সহ কয়েকটি রাজ্যে ৩ অক্টোবরের পরিবর্তে অন্যদিনে এই কর্মসূচী অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত হয়। মনোজ কান্তি গুহ বলেন, কর্মসংস্থানহীনতা বা বেকারী এই মুহূর্তে সারা বিশ্বের একটি বড় সমস্যা। নয়া উদার অর্থনীতির এই যুগে বেকারী ক্রমশ ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সংগঠিত শ্রমিকশ্রেণী ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। তার জায়গায় চুক্তিপ্রথা, ঠিকাপ্রথায় শ্রমিক নিযুক্ত হচ্ছে। নিত্যনতুন প্রযুক্তি আবিস্কারের মধ্য দিয়ে স্থায়ীশ্রমিক কর্মচ্যুত হচ্ছেন। আবার নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে না। ফলে কর্মসংস্থানহীনতা সারা পৃথিবীতে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাধারণ সম্পাদকের প্রারম্ভিক বক্তব্যের পর বক্তব্য রাখেন ড. অসীম দাশগুপ্ত। তাঁর অত্যন্ত মনোগ্রাহী এবং শিক্ষামূলক বক্তব্য উপস্থিত সকলকে উৎসাহিত করে **(ড. অসীম দাশগুপ্তের পূর্ণাঙ্গ বক্তব্যের প্রথম অংশ পঞ্চম পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হল)**। এছাড়াও এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের অন্যতম সম্পাদক অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যতম সহ-সভাপতি স্মরজিত রায় চৌধুরী। □

মনোজ কান্তি গুহ

বলিভিয়ায় তৃতীয়বার নির্বাচিত ইভো মোরালেস

ইভো মোরালেস

লাতিন আমেরিকার বলিভিয়ায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরপর তিনবার জনসমর্থনের জোয়ারে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন বামপন্থী প্রার্থী ইভো মোরালেস। এবারের নির্বাচনে বলিভিয়ার ৯টি প্রদেশের মধ্যে ৮টি প্রদেশেই জয়ী হয়েছে মুভমেন্ট ফর সোস্যালিজম দল। ইভো মোরালেস পেয়েছেন ২৯,১১,১৩২ অর্থাৎ ৬০.৮৯ শতাংশ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডেমোক্র্যাট ইউনিটি-র প্রার্থী সামুয়েল ডোরিয়া মেডিনা ১১.৭০.৯৬২ অর্থাৎ ২৪.৪৯ শতাংশ ভোট পেয়েছেন। মোট ১২টি রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল।

হাউস অফ ডেপুটিস-এ ১৩০টি আসনের মধ্যে ৮০টি এবং সেনেটে ৩৬টি আসনের মধ্যে ২৪টি আসনে জয়ী হয়েছে ইভো মোরালেসের দল মুভমেন্ট ফর সোস্যালিজম।

২০০৬ সালে প্রথম দেশের আদিম জনগোষ্ঠী থেকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ইভো মোরালেস। নয়া উদারনীতির পথ পরিত্যাগ করে বিকল্প সমাজতান্ত্রিক পথে সংস্কার কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যান। বেসরকারিকরণের পরিবর্তে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের নীতি গ্রহণ করেন। বলিভিয়ার পেট্রোলিয়াম শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করা হয়। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের আর্থিক আগ্রাসনের মোকাবিলায় যোগ দেয় বলিভিয়ান অলটারনেটিভ ফর দি আমেরিকাস (আলবা) জোটে। দেশের গরিব মানুষের জন স্বাস্থ্য, শিক্ষার মতো পরিকল্পনা চালু করা হয়। বেকারী অবসানে গড়ে ওঠে ৫০০০ ছোট শিল্প ক্ষেত্র। সমাজে সুস্থ সংস্কৃতির প্রচলনে খোলা হয় বহু জিমনাসিয়ামের মতো ক্রীড়াকেন্দ্র। দরিদ্র এবং প্রান্তিক আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য খাদ্য নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে সরকার। গ্রামের কৃষকদের সরবরাহ করা হয় ঋণ, প্রশিক্ষণ, বীজ ও সার ছাড়াও কৃষি সরঞ্জাম। শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন বৃদ্ধি, আদিম জনগোষ্ঠীর মানুষের বিকাশ ও উন্নয়নে বিভিন্ন আর্থ সামাজিক পরিকল্পনা সফলভাবে কার্যকর করেছে বলিভিয়ার সরকার।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই সাফল্যকে ইভো মোরালেস উৎসর্গ করেছেন কিউবা বিপ্লবের অন্যতম রূপকার ফিদেল কাস্ত্রো এবং ভেনেজুয়েলার প্রয়াত রাষ্ট্রপতি উগো সাভেজকে। লা পাজে দেওয়া ভাষণে পুনর্নির্বাচিত ইভো মোরালেস জানান— ‘সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তি এবং ঔপনিবেশিকতা বিরোধী শক্তির পক্ষেই এই জনাদেশ। নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গেই আমরা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যও আগুয়ান হবো।’ □

লাতিন আমেরিকায় বামপন্থার অগ্রগতি অব্যাহত

এই নিয়ে চতুর্থবার ব্রাজিলের রাষ্ট্রপতি ভোটে বামপন্থী শক্তির জয় অব্যাহত থাকল। দ্বিতীয় দফার চূড়ান্ত নির্বাচনে বামপন্থীদের প্রার্থী দিলমা রুসেফ ৫১.৬ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেছেন। এবারের নির্বাচনের মূল প্রশ্ন ছিল কর্পোরেট বান্ধব নয়া উদারবাদী সংস্কার না পূর্ণাঙ্গ সামাজিক বিকাশ-কোন পথে এগোবে আজকের ব্রাজিল। কর্পোরেট নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যমের লাগাতার কুৎসা দেশের কিছু লোককে বিভ্রান্ত করলেও সবাইকে ভোলানো সম্ভব হয়নি। ব্রাজিলের শ্রমিকশ্রেণী আস্থা রেখেছে বামপন্থী ওয়ার্কার্স পার্টি ও দেশের রাষ্ট্রপতি দিলমা রুসেফের ওপরেই। নয়া উদারবাদী ছাঁটাই সংস্কৃতির কবলে পড়ার চেয়ে শক্তপোক্ত অর্থনৈতিক

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে)

পেট্রোলের পর বিনিয়ন্ত্রণের তালিকায় ডিজেল

ডিজেলের মূল্য নির্ধারণে ধাপে ধাপে ভর্তুকি হ্রাস করে পেট্রোলের মতো একেও নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল আগেই—দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের আমলে। ২০১৩ সালের গোড়া থেকে তা কার্যকারীও করা হয়। প্রতি মাসে লিটার পিছু ডিজেলের দাম বাড়তে থাকে ৫০ পয়সা করে। এইভাবে গত বছর জানুয়ারি থেকে ১৯ মাসে ডিজেলের দাম বাড়ে লিটার পিছু ১১.৮১ টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রে সরকারের

পরিবর্তন ঘটলেও, একই নীতি অনুসৃত হতে থাকে। কংগ্রেসের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে মানুষ বিজেপিকে ভোট দিলেও, আরও বহু বিষয়ের মতোই ডিজেলের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানির মূল্য বিনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে এই দুই দলের নীতি একই। তবে তথাকথিত সংস্কারমূলক কাজের প্রশ্নে বি জে পি কংগ্রেসের থেকেও অনেক বেশী দ্রুতগামী। তাই ধাপে ধাপে বিনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিতে তারা হাঁফিয়ে উঠেছিল। এক ধাক্কায় কার্যসিদ্ধি করার জন্য তারা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমার ফলে, বি জে পি সরকার সেই সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ এই মুহূর্তে বিনিয়ন্ত্রণ চালু করলে বাজারে ডিজেলের দামও সাময়িকভাবে কিছুটা কমবে। ফলে মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজটাও সহজ হবে। যেমন আপাতত প্রতি লিটারে ডিজেলের দাম কমলো ৩.৩৭ টাকা। যা আড়াল করার চেষ্টা হচ্ছে, তা হল ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে ডিজেলের দাম ছিল প্রতি লিটারে ৩০.৯৬ টাকা। পরের পাঁচ বছরে ধাপে ধাপে বেড়ে হয় ৫৮.৯৭ টাকা। অর্থাৎ পাঁচ বছরে লিটার পিছু ২৮ টাকা দাম বাড়ার পর, কমল মাত্র ৩.৩৭ টাকা। এবং তাও সাময়িক। কারণ ভবিষ্যতে ডিজেলের মূল্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকারের হাতে আর না থাকার ফলে, আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম

(চতুর্থ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

সপ্তদশ রাজ্য কাউন্সিলের তৃতীয় সভা চলছে

রাজ্য কাউন্সিল সভার একাংশ

সপ্তদশ রাজ্য কাউন্সিলের তৃতীয় সভা ৩১ অক্টোবর শুরু হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই সভা ১ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে। ৩১ অক্টোবর বিকেল ঠিক ৪টায় এই সভার সূচনা হয়। দু’দিনের এই সভা পরিচালনা করছেন অশোক পাত্র, চুনীলাল মুখার্জী, চন্দন ঘোষ ও কৃষ্ণা বসুকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। এই সংখ্যা যখন ছাপতে যাচ্ছে তখন সাধারণ সম্পাদকের উত্থাপিত প্রস্তাবের ওপর আলোচনা চলছে। আশু আন্দোলন ও সংগঠনগত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই কাউন্সিল সভায় গৃহীত হতে চলেছে। নভেম্বর’ ১৪ সংখ্যার সংগ্রামী হাতিয়ারে এই কাউন্সিল সভার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হবে। □

দাম বাড়লো প্রাকৃতিক গ্যাসের

১৮ অক্টোবর ২০১৪, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ডিজেলের দামের বিনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এবং তা হল, প্রাকৃতিক গ্যাসের একক পিছু দাম বৃদ্ধি। কৃষ্ণা-গোদাবরি অববাহিকায় প্রাকৃতিক গ্যাস নির্গমনের কাজ করছে মুকেশ আম্বানির রিলায়েন্স গোষ্ঠী। তারা দীর্ঘদিন ধরেই পূর্বতন সরকারের কাছে প্রাকৃতিক গ্যাসের একক প্রতি দাম বৃদ্ধির জন্য সওয়াল করছিল। তাদের দাবি মেনেই ইউ পি এ-২ সরকার প্রাকৃতিক গ্যাসের দাম একক প্রতি ৪.২ মার্কিন ডলার থেকে দ্বি-গুণ বৃদ্ধি করে ৮.৪ ডলার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। যদিও তা কার্যকরী হয়নি। নির্বাচনের পর গঠিত মোদি সরকার দাম বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করে। সেই

(দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে)

সংগ্রামী হাতিয়ার
অক্টোবর ২০১৪
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
৪৩তম বর্ষ □ ষষ্ঠ সংখ্যা □ মূল্য এক টাকা

সম্পাদকীয়

এই কি আমাদের 'সোনার বাংলা'?

আজকের পশ্চিম বাংলা— প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতায়, টেলিভিশনের বিভিন্ন চ্যানেলে যে ছবি ফুটে উঠছে, তার সাথে কি আমাদের আগে পরিচয় ছিল? আমাদের অভিজ্ঞতা কি বলে? সম্পাদকীয় কলমের শুরুতেই এই প্রশ্নটা তোলা হল, কারণ অধিকাংশ মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমে সব কথা বলার মাঝে, একটা নির্দিষ্ট কথা জুড়ে দিতে তাঁরা ভুলছেন না। তা হল, আজকের পশ্চিমবাংলায় শাসকদলের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে যে সমস্ত অন্যায়-অবিচার লাঞ্ছনা-উৎপীড়ন-অত্যাচারের ঘটনা প্রতিদিনই ঘটে চলেছে, তা নাকি পূর্বতন বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও ঘটত। আজ শুধু এই সমস্ত অনাসৃষ্টির নাকি পরিমাণগত বৃদ্ধি ঘটেছে আর কিছু নয়। গণমাধ্যমগুলি এই কথা বলছে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে যা অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। কিন্তু তার আগে, যা বলা হচ্ছে, তা কতটা ঠিক তাও বিবেচনা করা দরকার।

একটা বিষয় লক্ষণীয়। এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিত হিসেবে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনকালের সাথে বর্তমান শাসকদলের মাত্র সাড়ে তিন বছরের কার্যকালকে ধরা হচ্ছে। যুক্তি বিজ্ঞানের নিরিখে যা অযৌক্তিক। অথচ এই গণমাধ্যম গোষ্ঠীই কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে যখন সরকারের পরিবর্তন হল, তখন সেই পরিবর্তনকে, ১৯৭৭ সালে জরুরি অবস্থার অবসানের পর বামফ্রন্টের সরকার গঠনের মতন একইরকম তাৎপর্যবাহী বলে অভিহিত করেছিল। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নেওয়া হয় যে, সেই মূল্যায়ন সঠিক ছিল, তাহলে বামফ্রন্টের শুরুর তিনবছরের সাথে তৃণমূলের শুরুর তিন বছরের তুলনা কেন নয়? এই প্রশ্নে বিভিন্ন 'মিডিয়া-হাউস' নিরুত্তর।

তবুও আমরা এই বিতর্কে না ঢুকে, গণমাধ্যমের নির্বাচিত প্রেক্ষিতকে ধরেই আলোচনা করতে পারি। এই আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় হিসেবে আমরা মূলত আইন-শৃঙ্খলা ও তজ্জনিত বিষয়গুলিকে রাখব। কারণ এই বিষয়গুলিকে নিয়েই শোরগোল চলছে। তবে দুটি সরকারের চরিত্রগত পার্থক্য বোঝাতে অন্যান্য বিষয়গুলিকেও আনা দরকার।

মিডিয়ায় আলোচনার এখন দুটি কেন্দ্রীয় বিষয় (১) সারদা কাণ্ড, (২) বর্ধমানের বিস্ফোরণ কাণ্ড। সারদা কাণ্ডে শাসকদলের হোমড়া-চোমড়াদের যোগাযোগ আজ দিনের আলোর মতই পরিষ্কার। সিবিআই তদন্তের ফলাফল যাই হোক না কেন, শাসকদলের শীর্ষ নেতাদের ছত্রছায়াতেই যে সারদাগোষ্ঠীর বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, সাধারণ মানুষের তা অজানা নয়। বামফ্রন্টের সময়েও কয়েকটি চিটফান্ড নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়েছিল। যেমন সঞ্চয়িতা, সঞ্চয়িনী, ভেরোনা ইত্যাদি। কিন্তু একথা কি কেউ বলতে পারবেন যে ঐ চিটফান্ডগুলির সাথে বামফ্রন্টের শীর্ষনেতাদের এরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল? বা বামফ্রন্টের নেতাদের ছত্রছায়াতেই এদের বাড়-বাড়ন্ত হয়েছিল? চিটফান্ডকে কেন্দ্র করে মিথ্যা ভাষণও কি তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে শোনা গিয়েছিল। না যায় নি।

বর্ধমানের বিস্ফোরণ কাণ্ডের মধ্য দিয়ে ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে বাংলাদেশের একটি মৌলবাদী-সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী তাদের অস্ত্রভাণ্ডার তৈরি করছে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায়। এও জানা যাচ্ছে, এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী গত দু'বছর ধরে পশ্চিমবাংলায় ঘাঁটি গাড়তে শুরু করেছে এবং বহু জায়গাতে তাদের ডেরা খুঁজে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে শাসকদলের কর্মীরা। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের বাড়িটিও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতার সক্রিয় সহযোগিতার মধ্য দিয়ে ভাড়া নিতে পেরেছিল। সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদে পরিকল্পনা রচনা করার সুযোগ করে দেওয়ার এমন ঘটনা বামফ্রন্টের আমলে ঘটেছিল? বামফ্রন্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর রয়েছে, এমন মন্তব্য করার সুযোগ কোন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা পেরেছিল?

এবার আমরা চোখ ফেরাতে পারি সাধারণ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দিকে। প্রায় প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না কোথাও সংঘর্ষ ও হত্যার ঘটনা ঘটছে। কখনও টার্গেট বিরোধী দল, কখনও লুটের বখরা নিয়ে নিজেরাই নিজেদের মারছে। এমনকি স্বয়ং অধ্যক্ষের নির্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ঢুকে বহিরাগত সমাজবিরোধীরা ছাত্রদের পেটাচ্ছে, ছাত্রীদের শ্লীলতাহানি করছে। এমন ঘটনা বামফ্রন্টের আমলে ঘটত?

বামফ্রন্টের আমলে নাকি দলতন্ত্র ছিল। তাই নির্বাচনের আগে বর্তমান শাসকদলের শ্লোগান ছিল 'দলতন্ত্র নয় গণতন্ত্র চাই।' তা কেমন গণতন্ত্রের চেহারা গত সাড়ে তিন বছর ধরে প্রত্যক্ষ করছেন মানুষ? সভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কোন প্রশ্ন করলে, বা ইন্টারনেটে কোন কার্টুন পোস্ট করলে জেলে পোরা হচ্ছে। অথচ খুনের আসামী শাসকদলের নামাবলী গায়ে চড়িয়ে বহাল তবিয়তে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর পাশে বসে জনসভা করছে। পুলিশ নীরব দর্শক! শাসকদলের নেতা থানায় বসে পুলিশকে নির্দেশ দিচ্ছেন কি করতে হবে। গ্রাম দখল অভিযানে শাসক দলের মস্তানবাহিনীকে এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রী গিয়ে থানার লকআপ থেকে আসামীকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। পুলিশ শুধু সক্রিয় হয়ে উঠছে যখন ছাত্ররা তাদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নামছে। ভ্যানে তুলে পিটিয়ে মেরে রাস্তায় ফেলে দিচ্ছে। এমন দল দাসত্বের চেহারায় পুলিশ ছিল বাম জমানায়? ফসলের ন্যায্য দাম না পেয়ে কৃষকের আত্মহত্যা—মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশে শোনা যেত। পশ্চিমবঙ্গে শোনা যায় নি। কিন্তু শোনা গেল গত সাড়ে তিন বছরে। শিল্পের হাল—শিল্পপতিরাই বলছেন তোলাবাজির ঠেলায় তাঁরা পাততাড়ি গোটাতে বাধ্য হচ্ছেন। এমন অভিযোগ বামফ্রন্টের আমলে কখনও উঠেছে?

সরকারী স্বাস্থ্য পরিষেবা বামফ্রন্টের আমলেও সোনায় মোড়া ছিল— এই দাবি কেউ করবেন না। কিন্তু এমন ফি-বৎসর শিশু মৃত্যুর ঘটনা, ম্যালেরিয়া, এনকেফেলাইটিস, ডেঙ্গু প্রতিরোধে চূড়ান্ত অব্যবস্থা, এমনকি রক্ত পরীক্ষার কিট্‌স্ প্রয়োজনীয় সংখ্যায় না থাকা ইত্যাদি যা যা শোনা গেছে গত সাড়ে তিন বছরে তা রাজ্যবাসীর অভিজ্ঞতায় ছিল? সব শেষে নিজেদের প্রসঙ্গ— সরকারী কর্মচারীদের প্রসঙ্গ। চিকিৎসক, নার্স, করণিক, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সম্মান ও মর্যাদা আজ ধূলোয় লুটোচ্ছে। নতুন অধিকার অর্জন তো দূরের কথা, অর্জিত অধিকার রক্ষা করাই দায় হয়ে পড়েছে। অথচ বামফ্রন্ট আমলে বছরে ২ কিস্তি মহার্ঘভাতা, বেতন কমিশন ও অন্যান্য দাবি সহ বহু সমস্যা মিটেছে। কোন একজন কর্মচারী বন্ধুও কি বলবেন যে এখনকার পরিস্থিতি বাম আমলেও ছিল?

এতগুলো স্পষ্ট পার্থক্য এবং আরও অনেক কিছুই, মিডিয়ার নজরে যে নেই তা নয়। নজরে থাকা সত্ত্বেও তাঁরা এরাও খারাপ, ওরাও খারাপ ছিল এই তত্ত্ব পরিকল্পিতভাবে হাজির করছে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে। তা হল, পশ্চিমবাংলা মানুষের বাম রাজনীতির প্রতি যে সহজাত আকর্ষণ তাকে বিনষ্ট করা। যাতে ভবিষ্যতে রাজ্যের মানুষের ভবিতব্য হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় একদিকে একটি লুম্পেন গোষ্ঠী আর অপরদিকে একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক শক্তি। ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমির। এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করার জন্য পথে নামা দরকার। □

৩১ অক্টোবর ২০১৪

'বুল অবতার'

মদীয় দেশের রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি নয়া উদারবাদী পথ পরিগ্রহ করিবার অনিবার্য ফলস্বরূপ, শেয়ারবাজার লইয়া মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতেছে। বলা ভাল মানুষকে শেয়ারবাজার অভিমুখী করিবার প্রয়াসও চলিতেছে। ইহাই স্বাভাবিক। কারণ উদারবাদী অর্থনীতির চালিকা শক্তি হইল ফাটকা পুঁজি এবং শেয়ারবাজার তাহার গর্ভগৃহ। স্বভাবতই মানুষের সঞ্চয় শেয়ারবাজার অভিমুখে ধাবিত হইলে, তাহা চাঙ্গা হইয়া উঠিবে এবং ফাটকা পুঁজি পিপিলিকার ন্যায় লাভের গুরটি খাইতে পারিবে। উক্ত শেয়ারবাজারের যে সূচক তাহার পোশাকি নাম হইল 'বুল' অর্থে ষাঁড়। কিন্তু উক্ত বুলকে লইয়া আলোচনা এক্ষণে সাঙ্গ করিয়া, ভিন্নধর্মী এক 'বুল'কে লইয়া আলোচনার সূত্রপাত করা যাইতে পারে। ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য উল্লেখ রাখা ভাল, আলোচ্য 'বুল' কোন মনুষ্যতের জীব নহে। আকৃতিতে সম্পূর্ণ রক্ত-মাংসের একজন মানুষ। তবে তার প্রকৃতি মনুষ্য পদবাচ্য কিনা তাহা তর্কের উর্ধ্বে নহে। এহেন 'বুল' মহাশয়কে লইয়া আলোচনা এই সময়ে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে জোর কদমে চলিতেছে। কারণ তিনি শুধু মাত্র একজন ব্যক্তি নহেন। তিনি বর্তমান শাসকদলের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন। শচীন তেন্ডুলকর যেমন ক্রিকেটে বিস্তর কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, তেমনই 'বুল' মহাশয়ও ইতোমধ্যেই রাজনীতির জগতে সুমহান কীর্তি স্থাপন করিয়াছেন, করিতেছেন। তাহার ইনিংসের সূচনা হইয়াছিল বিরোধী দলের নেতাকে আক্রমণ করিয়া। পরবর্তীতে তিনি এক অধ্যাপিকার ললাট লক্ষ্য করিয়া জগ ছুঁড়িয়া ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বিদ্যালয়ের গন্ডী অতিক্রম করিয়া, কলেজ প্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ করিবার সুযোগ তাহার না ঘটিলেও, শাসকদলের জ্যোতিষ্ক হইবার সুবাদে কলেজ পরিচালন সমিতির কর্তাব্যক্তি হইতে তাহার বাধে নাই। এইভাবে ক্রমান্বয়ে তাহার কীর্তির পরিধি বিস্তৃত হইতে হইতে এক্ষণে সর্বগ্রাসী হইয়াছে। বর্তমানে তিনি তাহার নিজদলের কর্মীগণকেও রেহাই করেন না। তাহার সম্পদ আহরণ প্রক্রিয়ায় কেহ ভাগ বসাইতে চাহিলেই রে রে করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইতেছেন। অভিযোগ হত্যায় মদতও দিয়াছেন। তাহার কীর্তির তালিকা এখানেই সমাপ্ত হইতেছে না। পুলিশ কাহাকে গ্রেপ্তার করিবে কাহাকে করিবে না তাহাও তাহার নির্দেশ মোতাবেক ঘটে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে 'বুল মহাশয়' পশ্চিমবঙ্গে অধুনা যে রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম হইয়াছে তাহার সার্থক প্রতিনিধি। এহেন একাধিক অবতার বিভিন্ন জেলায় রাজত্ব করিতেছেন। প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতা জুড়িয়া তাহাদের কীর্তি কাহিনী প্রকাশিত হইতেছে। সমস্ত কিছু দেখিয়া শুনিয়া ভ্রম হইতেছে আমরা কি জঙ্গলের রাজত্বে বাস করিতেছি? □

১৩ কার্তিক ১৪২১

রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে

অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে যে কোনো পার্থক্য নেই, প্রতি পদে তা প্রমাণ করে চলেছে মোদি সরকার। ইউ পি এ যেখানে থেমে ছিল বা থামতে বাধ্য হয়েছিল, সেখান থেকেই শুরু করেছে এন ডি এ। ডিজেলের মূল্যের বিনিয়ন্ত্রণ, প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির মতোই আর একটি পদক্ষেপ হল, রান্নার গ্যাসের ভর্তুকি নগদে সরাসরি চলে যাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার স্কিম আপাতত চালু হবে ৫৪টি জেলায় ১৫ নভেম্বর থেকে। ১ জানুয়ারি থেকে চালু হবে গোটা দেশে। ইউ পি এ সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে বর্তমান সরকারের সিদ্ধান্তের পার্থক্যটুকু হল, ইউ পি এ এই নগদে ভর্তুকি ব্যবস্থাকে আধার কার্ডের সাথে যুক্ত করেছিল। অর্থাৎ এই সুবিধা পেতে গেলে আধার কার্ড ছিল বাধ্যতামূলক। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আধা কার্ডের বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তোলে। ফলে বর্তমান সরকার আধারকার্ডের কথা না বলে, বলেছে যাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে তারাই এই সুযোগ পাবে। এমন কি যারা জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট খুলেছে তারাও এই সুযোগ পাবে। জনধন যোজনায় অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে প্রায় ৬ কোটি। যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, তারা কিছুদিন বর্তমানে চালু ব্যবস্থার সুযোগ পাবে। এর মধ্য দিয়ে ভর্তুকিযুক্ত গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহ পদ্ধতির অবসান হতে চলেছে। সিলিন্ডার কিনতে হবে বাজার দরে। ভর্তুকির সমপরিমাণ অর্থ সোজাসুজি চলে যাবে গ্রাহকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। □

সন্ত্রাসবাদ-মৌলবাদের বিরুদ্ধে শ্রমিক-কর্মচারীদের মিছিল

গত ৩০ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং রাজ্য জুড়ে সন্ত্রাসবাদী, মৌলবাদী কার্যকলাপ ও সারদা চিটফান্ডে জড়িত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কলকাতার বুকে একটি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এই মিছিলের আহ্বায়ক ছিল বামপন্থী কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলি। ১২ই জুলাই কমিটির ডাকে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও পেনশনার্সরাও এই মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। □

১২ নভেম্বর দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট

আগামী ১২ নভেম্বর দেশ জুড়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট। বেতন বৃদ্ধিসহ এক গুচ্ছ দাবিতে এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। বন্ধ থাকবে এটিএমও। দাবি আদায়ে একদিনের ধর্মঘটের পাশাপাশি ডিসেম্বরে ডাক দেয়া হয়েছে রিলে ধর্মঘটেরও। ফলে পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা পূর্ব ভারতে ফের ব্যাঙ্ক ধর্মঘট ৪ ডিসেম্বর।

বাড়ছে ব্যাঙ্কের মুনাফা। অথচ চুক্তি মাফিক বেতন বাড়ছে না কর্মী ও অফিসাদের। প্রতিবাদে দেশ জুড়ে ধর্মঘটের রাস্তায় সবক'টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের অফিসার ও কর্মী ইউনিয়ন। আগামী ১২ নভেম্বরে ব্যাঙ্ক ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। ধর্মঘটের আওতায় রাখা হয়েছে এটিএমগুলিকেও।

২০১১-১২ আর্থিক বর্ষে শেষবার বেতন পুনর্বিন্যাস হয়েছিল ব্যাঙ্কিং সেক্টরে। অফিসার ও কর্মীদের দাবি, ২৫ শতাংশ হারে তাঁদের বেতন বাড়াতে হবে। কিন্তু ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কার্স অ্যাসোসিয়েশনের বক্তব্য, সর্বাধিক ১১ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে বেতন। এই প্রস্তাব মানতে নারাজ ব্যাঙ্ক অফিসার, কর্মচারীরা। ধর্মঘটের আগে ১১ নভেম্বর কলকাতায় বিবাদী বাগ থেকে বিক্ষোভ মিছিলও করবেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা।

শুধু নভেম্বরে ধর্মঘটেই শেষ নয়। ডিসেম্বরে ডাকা হয়েছে রিলে স্ট্রাইক। ২ ডিসেম্বর দেশের দক্ষিণের রাজ্যগুলিতে, ৩ তারিখ উত্তরে, ৪ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গসহ পূর্ব প্রান্তের রাজ্যগুলিতে ধর্মঘটে সামিল হবেন ব্যাঙ্ক কর্মী, অফিসাররা। □

লাতিন আমেরিকায়

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

ভিত্তি এবং সামাজিক বৈষম্য কমানোর কান্ডারী বামপন্থীদের পুনর্নির্বাচিত করাকেই শ্রেয় মনে করেছেন ব্রাজিলের সাধারণ মানুষ। দেশের ২৭টি প্রদেশের মধ্যে ১৪টি প্রদেশে নির্বাচিত হয়েছেন ওয়ার্কার্স পার্টির প্রার্থীরা। বিরোধী প্রার্থী নেভেসের নিজের প্রদেশেও জয়ী হয়েছে বামপন্থীরাই।

এদিকে, উরুগুয়েতেও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রথম দফায় জয়ী হয়েছেন বামপন্থা ঘেঁষা ব্রডফ্রন্টের প্রার্থী তাবারে ভাসকোয়েজ। গত ২৬শে অক্টোবর অনুষ্ঠিত প্রথম দফার নির্বাচনে ভাসকোয়েজ পেয়েছেন ৪৯.৪ শতাংশ ভোট। দ্বিতীয় দফার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৩০শে নভেম্বর। এর আগে ২০০৫ সালে প্রথমবার উরুগুয়ের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ভাসকোয়েজ। □

দাম বাড়লো প্রাকৃতিক গ্যাসের

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

কমিটির সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা প্রাকৃতিক গ্যাসের একক প্রতি দাম নির্ধারণ করল ৫.৬১ মার্কিন ডলার। তবে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রতি বার্তা পাঠানো হয়েছে, কৃষ্ণা-গোদাবরি অববাহিকায় চুক্তি মাফিক গ্যাস উৎপাদন না করা পর্যন্ত এই বাড়তি দাম তারা নিতে পারবে না। প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব পড়বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। একক প্রতি ১ ডলার মূল্যবৃদ্ধির ফলে ইউরিয়া উৎপাদনে খরচ বাড়বে টন পিছু ১৩৭০ টাকা। সারের দাম বাড়বে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচও বৃদ্ধি পাবে ইউনিট পিছু ৪৫ পয়সা। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই কৃষি পণ্যেরও মূল্যবৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও সিএনজি-র দাম বাড়বে প্রতি কেজিতে ৪.২৫ টাকা। পাইপে সরবরাহকৃত রান্নার গ্যাসের দাম বাড়বে ২.৬০ টাকা। □

পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি কিসের ইঙ্গিত

চৌষট্টি বছরের পরিকল্পনা কমিশনের অবশেষে মৃত্যু পরোয়ানা জারি করা হল। পনেরোই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর লালকেল্লার ভাষণে এই নিদান হেঁকেছেন। তিনি বলেছেন 'পরিকল্পনা কমিশন অবলুপ্ত হবে। তৈরি হবে নতুন প্রতিষ্ঠান।' এই ভাষণের পর দু'মাসের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু নতুন প্রতিষ্ঠান গঠন দুরের কথা, তার ন্যূনতম কাঠামোরও কোনো পূর্বাভাষ এখনও মেলেনি। প্রধানমন্ত্রীর এই নিদানে বলাই বাহুল্য বৃহৎ কর্পোরেট হাউস দারুণ খুশি। শিল্পপতিদের সংস্থা ফিকির জনৈক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক এই সিদ্ধান্তকে 'এ ওয়েলকাম মুভ' বলে স্বাগত জানিয়েছেন। বামপন্থী দলগুলি সহ বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তি কেন্দ্রীয় সরকারের এই সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে একে বাজার মৌলবাদের কাছে নির্লজ্জ আত্মসমর্পণ বলে চিহ্নিত করেছে। বস্তুতপক্ষে পরিকল্পনা কমিশন বাতিলের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে নরেন্দ্র মোদী একসাথে তিনটি ধারণাকে নস্যাৎ করতে চাইছেন। প্রথমত স্বাধীনতা উত্তর কালে জওহরলাল নেহেরুর উদ্যোগে গৃহীত পরিকল্পিত অর্থনীতি যা মিশ্র অর্থনীতি বলে পরিচিত, সেই যুগটার সাথেই এর মধ্য দিয়ে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাওয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এর মধ্য দিয়ে বাজার সর্বস্বতাই যে জাতীয় অর্থনীতির একমাত্র ও প্রধান অভিমুখ হবে— সর্বত্র এই সঙ্কেত প্রেরণ। তৃতীয়ত, পরিকল্পনা কমিশনই শুধু নয় বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার সামনে সমস্ত বাধাকেই অপসারণ করা হবে। এই অর্থে পরিকল্পনা কমিশনের বিলোপ শেষ নয়, বরং শেষের শুরু।

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

এক

পরিকল্পনা কমিশনের বয়স ৬৪ বছর হলেও, তার গঠনপর্বের ইতিহাস আরও প্রাচীন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়েই, বিশেষত উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব যেমন দাদাভাই নৌরজি, আর সি দত্ত এবং মহাদেও গোবিন্দ রাণাডে দেশ থেকে দারিদ্র্য নির্মূল করতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁরা গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন যে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগের উপর যদি সরকার নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে উচ্চশিক্ষা, উন্নততর ব্যাঙ্কিংব্যবস্থা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকার বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবে না।

অবশ্য জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের অ্যাজেন্ডায় পরিকল্পিত অর্থনীতির প্রসঙ্গটি অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্নে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ১৯২৭ সালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহীত হয়। এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাঠামোটি সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। বিশেষত ১৯২৯-৩৩ সালে অর্থাৎ বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিতে যখন শিল্পোৎপাদন ব্যাপক হারে হ্রাস পায়, তার বিপ্রতীপে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নে এই সময় বিপুলহারে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এই ঘটনা সারা বিশ্বের অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনাবিদ ও রাজনৈতিক নেতাদের বিস্মিত করে। এই সময়েই অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্সের গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক 'এ জেনারেল থিওরি অব এমপ্লয়মেন্ট, ইন্টারেস্ট অ্যাণ্ড মানি'। অর্থনীতিতে চাহিদা সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ জরুরী— কেইন্সের এই তত্ত্বের অনুগামী হয়ে পড়ে বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত পুঁজিবাদী দেশ। কেইন্স প্রবর্তিত ডিমাণ্ড ম্যানেজমেন্ট মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার ধারণাটিকে প্রায় সমস্ত দেশই স্বাগত জানায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার সাফল্য এবং কেইন্সের মিশ্র অর্থনীতির তত্ত্ব, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনোজগতে দারুণ প্রভাব সৃষ্টি করে।

ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ইতিহাসে অনেকেই যাকে প্রাণপুরুষ বলে মনে করে, তিনি হলেন তৎকালীন মহীশূর রাজ্যের একজন প্রখ্যাত ইঞ্জিনীয়ার ও প্রশাসক স্যার এম বিশ্বেশ্বরাইয়া। ১৯৩৪ সালে তিনি রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত পুস্তক 'প্ল্যান্ড ইকনমি ফর ইন্ডিয়া'। এই পুস্তকে তিনি দশ বছরের পরিকল্পনার সুপারিশ করেন এবং পরিকল্পনার কাঠামো ও অন্তর্বস্তুতে তিনি শিল্পায়নের উপর জোর দেন। অবশ্য বিগত শতাব্দীর তিরিশের দশকে পরিকল্পনা ভাবনার ক্ষেত্রে আর একজন ব্যক্তির নাম এক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখের দাবী রাখে— ইনি হলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ১৯৩৮ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের হরিপুরা অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে সুভাষচন্দ্র বসু একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯৩৮ সালে ১৭ ডিসেম্বর একটি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতির পদে আসীন হন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে জাতীয় কংগ্রেস ভারতের উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে 'সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের উন্নয়ন'কে নির্দিষ্ট করে।

পরবর্তীকালে ১৯৪৪ সালে আর একটি পরিকল্পনার খসড়া তৈরি হয়। পুরুষোত্তম ঠাকুরদাসের নেতৃত্বে বোম্বাইয়ের টাটা-বিড়লা প্রমুখ আটজন শিল্পপতি এর রূপকার ছিলেন। 'বোম্বে প্ল্যান' বলে এটি পরিচিত ছিল। বোম্বে প্ল্যানের সময়কাল নির্ধারণ করা হয়েছিল পনেরো বছর। এই সময়কালে প্রকৃত জাতীয় আয় তিনগুণ ও মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় মুলধনের প্রয়োজন ধরা হয় ১০ হাজার কোটি টাকা। বোম্বে প্ল্যান ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেনি। অবশ্য দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠনগুলিও এর বিরোধিতা করে কারণ এই পরিকল্পনায় বেসরকারী পুঁজিপতিদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা ছিল। একই সময়ে গান্ধীজীর অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে আর একটি পরিকল্পনার খসড়াপত্র তৈরি হয়।

তবে ১৯৪৫ সালে বোম্বে প্ল্যানের এক বিকল্প পরিকল্পনা প্রয়োগ করেন তৎকালীন বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা মানবেন্দ্র নাথ রায়। পরিকল্পনার ইতিহাসে তা 'পিপ্‌লস্ প্ল্যান' বা জনগণের পরিকল্পনা নামে পরিচিত। এই পরিকল্পনার জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছিল ১৫ হাজার কোটি টাকা। এই পরিকল্পনার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল দেশের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।

ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ১৯৪৪ সালের পর থেকে ঘটতে শুরু করে। ১৯৪৬ সালে ভারতে গঠিত হয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এই সরকার গঠন করে 'পরিকল্পনা উপদেষ্টা পর্ষদ। এই পর্ষদ অবশ্য পরিকল্পনার তেমন কোনও সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে পারেনি। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে ১৯৫০ সালে পরিকল্পনার আর একটি খসড়াপত্র তৈরি হয়। এর রচয়িতা ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। এটি 'সর্বোদয় পরিকল্পনা' বলে পরিচিত।

স্বাধীন ভারতে ১৯৫০ সালের ১৫ মার্চ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রধানত পরিকল্পনা উপদেষ্টা পর্ষদের সুপারিশের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তক্রমে এটি গঠিত হয়। এই সদ্য গঠিত পরিকল্পনা কমিশনই স্বাধীন ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া রচনা করে। ১৯৫১ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু হয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং এর সাথেই শুরু হয় ভারতের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পথ চলা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উত্তরকালে পরিকল্পনা প্রণয়ণের ক্ষেত্রে প্রাক্ স্বাধীনতাকালে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রচিত পরিকল্পনাগুলিকে বর্তমান প্রেক্ষাপটে গুরুত্বহীন মনে হলেও, এগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য অপরিসীম। বিশেষত এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহ্য। একই সাথে এর মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতে স্বয়ম্ভর অর্থনীতি গড়ে তোলার ও আধুনিকীকরণের আকাঙ্ক্ষা ছিল তীব্র। পরিকল্পনা কমিশনের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে এই ধারণাকেই আক্রমণ করা হয়েছে।

দুই

পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি যখন ঘোষণা করা হল সেই সময়ে দ্বাদশ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১২-১৩ থেকে ২০১৭-১৮) চালু হয়েছে। বর্তমান বছরটি দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষ। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৬৪ বছরের সময়কালকে একই মানদণ্ডে বা একই পদ্ধতিতে বিচার করা যাবে না। এই সময়কালকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১৯৫১-১৯৯০ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (৮৫-৮৬ থেকে ৮৯-৯০) কাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় অংশটির সূত্রপাত অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে (১৯৯২-৯৩ থেকে ৯৬-৯৭)।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ১৯৫১ সালে গৃহীত হলেও সেই সময়ে এই ধরনের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার পক্ষে তেমন কোনও পরিবেশ ছিল না। তাছাড়া প্রথম পরিকল্পনা শুরু হয়েছিল এক জটিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের পর এদেশে উদ্ভূত সমস্যাগুলি ছিল প্রধানত অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা, খাদ্য সমস্যা, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি প্রভৃতি। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সাথে এই সব সমস্যা যুক্ত হওয়ায় সৃষ্টি হয়েছিল এক কঠিন পরিস্থিতি। ফলে এগুলিকে সামনে রেখেই পরিকল্পনার কতকগুলি লক্ষ্যমাত্রা নির্দিষ্ট করা হয়। এইসব উদ্যোগের মধ্যে ছিল (ক) কৃষির উপর গুরুত্ব আরোপের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, (খ) মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করা, (গ) উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান, (ঘ) জরুরী পরিকাঠামোর উন্নয়ন, (ঙ) সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির অনুসরণে আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট পরিকল্পনা ব্যয়ের ১৬.৬৪ শতাংশ সামাজিক কল্যাণখাতে বরাদ্দ করা হয়। প্রথম পরিকল্পনাকালে সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী গৃহীত হয় ও জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হয়। পরিবার পরিকল্পনা নীতিও এই সময় গৃহীত হয়। প্রথম অর্থ কমিশন (১৯৫২-৫৭) গঠিত হয় ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে। এই সময় উচ্চশিক্ষার গুরুত্ব বৃদ্ধি করতে ইউ জি সি এবং পাঁচটি আই আই টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

ভারতের পরিকল্পনাগুলির ইতিহাসে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ হল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৫৬-৫৭ থেকে ৬০-৬১)। এই পরিকল্পনা রচনার প্রেক্ষাপটে রয়েছে ১৯৫৪ সালে জাতীয় কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে গৃহীত 'সমাজাতন্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠনের' আহ্বান। এই সিদ্ধান্তের মূল কথা ছিল সামাজিক মালিকানায় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রকৃত প্রস্তাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর অনুসরণে ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস এই সময় থেকে শুরু হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে যুক্ত রয়েছে বিশিষ্ট রাশিবিদ অধ্যাপক প্রশান্ত চন্দ্র মহলানবিশের নাম। বস্তুতপক্ষে তিনিই ছিলেন এই পরিকল্পনার রূপকার। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনীতির অভিজ্ঞতাকে পরিকল্পনার রূপরেখা নির্ধারণে তিনি ব্যবহার করেন। এটি হল পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ। এর প্রতি ছিল প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর পূর্ণ সমর্থন। এই নীতিতে ভারী শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি গুরুত্ব পায় সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচী। এই খাতে ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা নয়। এই পরিকল্পনাকালে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র গড়ে ওঠে। বিশেষত ভিলাই, দুর্গাপুর ও রাউরকেল্লায় রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত কারখানা গড়ে ওঠে। এর পাশাপাশি দামোদর সেচ প্রকল্প, ভাকরা-নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণের কাজ জোর কদমে শুরু হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে ১৯৫৬ সালে নতুন শিল্পনীতি ঘোষিত হয়, ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের কার্যকলাপের সূচনা এবং জনগণের সঞ্চয় বৃদ্ধি ও মানুষের সঞ্চয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত জীবনবীমা নিগমের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কাল চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ এবং ভারত-পাক সংঘর্ষ ঘটে। এর অর্থনৈতিক প্রভাব পরিকল্পনার রূপরেখার উপরও পড়ে। এই পরিকল্পনায় যে সমস্ত উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট হয়— যেমন সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করে জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও আর্থিক স্বনির্ভরতা অর্জন, খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, দেশের মানব সম্পদের পূর্ণমাত্রায় ব্যবহারের লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় ও সম্পদের বৈষম্য দূরীকরণ প্রভৃতি বেশ খানিকটা ব্যহত হয়। তবে এই যোজনাকালে যথেষ্ট সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাষ্ট্রের সাহায্যে 'সবুজ বিপ্লব' সংগঠিত হওয়ার ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়কালে খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য প্রবর্তনের লক্ষ্যে গঠিত হয় ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়া।

বস্তুতপক্ষে এর পর পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয়। 'পরিকল্পনা ছুটি' 'বহমান প্ল্যান' প্রভৃতি নামে বার্ষিক পরিকল্পনা বেশ কয়েক বছর চালু হয়। তবে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যে দৃষ্টিভঙ্গী গৃহীত হয় সাধারণভাবে তা সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পর্যন্ত অনুসৃত হয়। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে (১৯৬৯-৭০ থেকে ৭৩-৭৪) ব্যাঙ্ক শিল্পের জাতীয়করণ ঘটে। প্রথম তিনটি পরিকল্পনায় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির মূল বিষয় অর্থাৎ সামাজিক ন্যায় বিচার ও ন্যায়পরায়ণতা প্রতিষ্ঠার প্রতি বিশেষ নজর পড়েনি। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৫ থেকে ৭৭-৭৮) কালে অভ্যন্তরীণ জরুরী অবস্থা জারি হয়। রুদ্ধ হয় গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এই সময় ঘোষিত হয় প্রধানমন্ত্রীর বিশ দফা কর্মসূচী যা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়। এর ঘোষিত লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য দূরীকরণ ও স্বনির্ভরতা অর্জন। এই সময়কালের ২টি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী হল দ্য স্পেশ্যাল কম্পোনেন্ট প্ল্যান (এস সি পি) এবং দ্য ট্রাইবাল সাব প্ল্যান (টি এস পি) চালু হয়। এখানে তফশিলী উপজাতিদের জন্য পরিকল্পনা বরাদ্দর ৮.২ শতাংশ বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রধানত একই পথ ধরেই অগ্রসর হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে প্রধান লক্ষ্যগুলি ছিল— (১) জাতীয় অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য পূরণে রোডম্যাপ তৈরি, (২) অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারসাম্য স্থাপন, (৩) জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের মাধ্যমে রাজ্যগুলির পরিকল্পনা বরাদ্দ স্থির করা, (৪) বৈদেশিক মন্ত্রক, প্রতিরক্ষা, পরিবেশ দপ্তর সহ বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় ঘটানো, (৫) অলিখিতভাবে বিভিন্ন মন্ত্রকের পরামর্শদাতা হিসাবে ভূমিকা পালন। এই পরিকল্পনা পর্বের সাফল্য এবং ব্যর্থতা উভয়ই আছে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য হিসাবে বলা যায় যে— (১) এই সময়কালে মাথাপিছু জাতীয় আয়, মোট জাতীয় আয় উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫০-৫১ সালে জাতীয় আয়ের পরিমাণ (১৯৮০-৮১ বছরের মূল্যমান অনুযায়ী) ছিল ৪০ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা, ১৯৯৬-৯৭ সালে তা দাঁড়ায় (ঐ একই মূল্যমানে) ২ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৭০ কোটি টাকা। (২) কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে। মোট জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অংশ হ্রাস পেলেও পরিমাণগত দিক থেকে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। (৩) শিল্পের উন্নয়ন ঘটেছে। বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ইস্পাত, বিদ্যুৎ, কয়লা, জ্বালানী তেল টেলি যোগাযোগ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অগ্রগতি লক্ষণীয়। বিশেষত শিল্প উৎপাদনে বৈচিত্র্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, বীমা, ডাকঘর সঞ্চয় প্রকল্প প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বিপুল এক বৃহৎ আর্থিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগে দেশে উন্নতমানের বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক সহ উন্নত মানের মানবসম্পদ সৃষ্টি হয়েছে ফলে আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহণেও অনেকটা অগ্রগতি ঘটে। (৪) প্রতিরক্ষা শিল্পে অগ্রগতি ঘটেছে।

পূর্বোক্ত সাফল্যগুলির মধ্যেও ব্যর্থতার দিকটিও অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, জাতীয় আয় ও মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধি হলেও তার সুষম বণ্টন হয়নি। নিচুতলার দরিদ্র মানুষ সম্পদ সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও, তারা এই অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। ফলে আয় ও সম্পদের বৈষম্য ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণতিতে দেশে একই সাথে কোটিপতি ও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা উভয়ই বৃদ্ধি পেয়েছে। দ্বিতীয়ত, দারিদ্র্য নিরসনে অনেক স্লোগান ও কর্মসূচী নেওয়া হলেও, তা বিশেষ কার্যকর হয়নি। তৃতীয়ত, বেকার সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা। পরিবেশ পরিস্থিতিকে বিচারের মধ্যে না এনে নির্বিচারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার কর্মসংস্থানের উপর অনেকক্ষেত্রেই নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চতুর্থত, সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রসঙ্গটি উপেক্ষিত হয়েছে। কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এটি অবশ্য কর্তব্য। পঞ্চমত, আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়নি। ফলে কালো টাকার একটি সমান্তরাল অর্থনীতি সৃষ্টি হয়েছে। ষষ্ঠত, মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধে ব্যর্থতা। সপ্তমত, কৃষকের স্বার্থে আমূল ভূমিসংস্কারে ব্যর্থতা। এর ফলে গ্রামীণ দারিদ্র্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পূর্বোক্ত ব্যর্থতার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। এই উন্নয়নের মূল কথা হল জি ডি পি ভিত্তিক উন্নয়ন। অর্থাৎ জি ডি পি বৃদ্ধি হলে অনিবার্যভাবেই তা চুঁইয়ে নিচের দিকে (যা ট্রিকল ডাউন থিওরি বলে পরিচিত) পড়বে। ব্যর্থতার মূল কারণ এখানে নিহিত। উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া উচিত ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার, সুষম বণ্টন, মানবিক মুখ ও কর্মসংস্থান।

(পঞ্চম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে)

বহুমাত্রিক সাংগঠনিক উদ্যোগ

সমবায় অডিটরদের কেন্দ্রীয় দাবিদিবস ও নিজস্ব মুখপত্র "নিরীক্ষক সহযোগ"-এর বিংশতিতম শারদ সংখ্যার উদ্বোধনী সভা

দাবি দিবসে প্রধান বক্তা মনোজ কান্তি গুহ

গত ২০-২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে কলকাতার মৌলালী যুবকেন্দ্রের বিবেকানন্দ অডিটোরিয়াম হলে রাজ্য কো-অডির্নেশন কমিটির অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিটর্স এসোসিয়েশন-এর ১০ দফা দাবীতে কেন্দ্রীয় দাবীদিবস ও সংগঠনের মুখপত্র "নিরীক্ষক সহযোগ"-এর বিংশতিতম শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে সারা রাজ্য হতে তিন শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানের প্রথম দিন সংগঠনের মুখপত্র নিরীক্ষক সহযোগ-এর বিংশতিতম শারদ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক কিন্নর রায়। তিনি বর্তমান আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে মুখপত্রের ভূমিকা প্রসঙ্গে শিক্ষণীয় বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন "নিরীক্ষক সহযোগ"-এর প্রকাশক অলোক বসু ও পত্রিকা সম্পাদক জয়দীপ সরকার। তারপর রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সামাজিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে সংগঠনের ১৫১ জন সদস্য মরণোত্তর নেত্রদান অঙ্গীকার করেন এবং এই সম্পর্কিত অঙ্গীকার পত্রগুলি ভানমুক্ত আই ব্যাঙ্ক তথা সল্টলেকের সুশ্রুত আই ফাউণ্ডেশন এণ্ড রিসার্চ সেন্টারের কর্মকর্তা সৈকত বিশ্বাস মহাশয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তিনি সংগঠনের সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সারা ভারতের মধ্যে আমাদের রাজ্য মরণোত্তর নেত্রদানের ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে আছে। মানুষের মধ্যে সচেতনতার অভাব — এর মূল কারণ। মৃতদেহ হতে শুধুমাত্র চোখের কর্ণিয়া সংগ্রহ করা হয় ফলে মৃত ব্যক্তির চোখের আকৃতি নষ্ট হয় না। মৃত্যুর চার ঘন্টার মধ্যে কর্ণিয়া সংগ্রহ করলে তা কোন দৃষ্টিহীন ব্যক্তির চোখে প্রতিস্থাপন করলে ঐ ব্যক্তি দৃষ্টি আংশিক ফিরে পায়।

প্রথমদিনের শেষ পর্যায়ে সংগঠনের ২৩টি রেঞ্জকে নিয়ে আন্তঃরেঞ্জ বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিষয় ঃ "সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর"। বিচারকমণ্ডলী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অর্থনীতির অধ্যাপক শ্রী দেবাশীষ সরকার, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীমতী শিখা মুখার্জী এবং আকাশবাণী কলকাতা সংবাদ বিভাগের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব শ্রী ভবেশ দাস।

কর্মসূচীর দ্বিতীয় দিনে সংগঠনের ন্যায্য ১০ দফা দাবীসনদ আনুষ্ঠানিকভাবে সভায় উত্থাপন করেন সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ভাস্কর ভট্টাচার্য্য। দাবিসনদের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুশান্ত ঘটক ও রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। মনোজকান্তি গুহ তাঁর বক্তব্যে বর্তমান অস্থির পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের সদা সচেতন থাকার আহ্বান জানান। রাজ্য সরকারের চরম বিমাতৃসুলভ আচরণ এবং কর্মচারীদের উপর দমন-পীড়ন, দূরবর্তী স্থানে বদলী ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে ধারাবাহিক আন্দোলন গড়ে তোলার শপথ নিতে হবে বলে উল্লেখ করেন। বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, প্রতিহিংসামূলক বদলী ও সন্ত্রাসের পরিবেশ বন্ধ, ষষ্ঠ বেতন কমিশন গঠন, সমবায় আন্দোলনের স্বার্থে নতুন সমবায় আইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পি এস সি মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োজিত সংখ্যাগরিষ্ঠ পদগুলির বেতনক্রমের ন্যায় অডিটর অফ কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ পদের বেতনক্রম নির্ধারণসহ ১০ দফা দাবী সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য মাননীয় সমবায় মন্ত্রী, সমবায় সচিব, সমবায় নিরীক্ষা অধিকর্তা, এবং সাধারণ সম্পাদক, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানাধিকারী ও সংশ্লিষ্ট রেঞ্জগুলিকে পুরস্কার বিতরণ করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ। মরণোত্তর নেত্রদানের অঙ্গীকারীদের শংসাপত্র প্রদানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্যা সুতপা হাজরা।

এরপর বিশিষ্ট শিল্পী শ্রীমতী শ্রাবণী সেন সভায় মনোজ্ঞ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।

সমগ্র সভাটি পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি গৌতম ঘোষ, অন্য দুইজন সহ সভাপতিদ্বয় যথাক্রমে মইনুল হক ও বিমল ঘোষকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। □

নিরিক্ষক সহযোগ শারদ সংখ্যার উদ্বোধনে কিন্নর রায়

তালিকায় ডিজেল

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বাড়লেই ডিজেলের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে। বলাবাহুল্য পরিবহন ব্যয় সহ সমস্ত পণ্যের মূল্যের ওপর এর প্রভাব পড়বে। আরও একটি বিষয় পরিষ্কার হল। কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে মানুষ বিজেপিকে নির্বাচিত করলেও, অর্থনৈতিক নীতির প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপি হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। □

পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের পঞ্চদশ জাতীয় সম্মেলন আগামী ২০ থেকে ২৩ ডিসেম্বর ২০১৪ পাঞ্জাবের চণ্ডীগড়ে (জিরেকপুর) অনুষ্ঠিত হবে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাতীয় সম্মেলনে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ৯০ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করবেন। □

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি পুরুলিয়া জেলা শাখার সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি, পুরুলিয়া জেলা শাখার আহ্বানে ১৮-১০-২০১৪ ও ১৯-১০-২০১৪ সকাল ৮টা থেকে স্থানীয় কর্মচারী ভবনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৯-১০-২০১৪ বিকাল ৫টায় সান্ধ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক ও তার সমতুল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কর্মচারীর পরিবারের ছেলে মেয়েদের সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপক ১০ জন করে উভয় ক্ষেত্রে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।

প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচীতে যথাক্রমে কর্মচারীদের জন্য তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, পরিবারের মহিলাদের জন্য শব্দছক পূরণ, নাট্যাংশ পঠন, পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য অঙ্কন, আবৃত্তি এবং মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েদের জন্য সাম্প্রতিককালের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সভার মতে "সাম্প্রতিক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলন নৈরাজ্যের নজির"—এই বিষয়ের উপর একটি বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এই কর্মসূচীকে কেন্দ্র করে ব্লক, মহকুমা, অঞ্চল স্তর পর্যন্ত প্রচার করা হয়। সংগঠনগত প্রতিযোগীদের নামের তালিকা প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। এছাড়া এই কর্মসূচী জেলা সংগঠনের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করে। জেলার প্রবীণ নেতৃত্বের উপস্থিতি কর্মসূচী আরো গুরুত্ব বাড়ায়। সান্ধ্য অনুষ্ঠানে বাড়ির মহিলাদের উপস্থিতি সাড়া জাগানোর মতো ছিল। ৯৮ জন প্রতিযোগীসহ মোট ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন। □

ছোটদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দর্শকবৃন্দ

দাবি দিবস ও কেন্দ্রীয় সমাবেশ

গত ২২ আগস্ট, ২০১৪ তারিখে বেলা ১.৩০ এ দমকল বাহিনীর প্রধান কার্যালয় প্রাঙ্গণে ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, ওয়েস্ট বেঙ্গল-এর আহ্বানে কেন্দ্রীয় সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলাগুলি থেকে প্রায় পাঁচ শতাধিক দমকল কর্মচারীদের উপস্থিতিতে মৌলিক ৪ দফা দাবিসহ দমকল কর্মচারীদের ১৬ দফা দাবি প্রস্তাব উত্থাপন করেন অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক নিতোষ নন্দী, উক্ত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন সাধারণ সম্পাদক রঞ্জন কুমার দে, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোজকান্তি গুহ এবং ফায়ার সার্ভিস অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশন, ওয়েস্ট বেঙ্গলের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। এছাড়া রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক গোপাল পাঠক উপস্থিত ছিলেন। সমিতির সভাপতি অসিত দত্ত ও সহসভাপতি ফণীভূষণ দাসকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সমাবেশ পরিচালনা করেন।□

আলোচনা সভা

গত ২৪ আগস্ট, ২০১৪ উত্তর দিনাজপুর জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির মহিলা উপসমিতির উদ্যোগে 'নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে' শীর্ষক আলোচনা, সমাবেশ ও প্রস্তাব গ্রহণের কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ৪১ জন মহিলা সহ ৬০ জন উপস্থিত ছিলেন। প্রস্তাব উত্থাপন করেন মহিলা উপসমিতির আহ্বায়িকা সোমা কর এবং সমর্থনে বক্তব্য রাখেন মহিলা উপসমিতির অন্যতম সদস্য মাধবী দেবনাথ। সভার প্রারম্ভে সাংস্কৃতিক শাখার পক্ষ থেকে পরিবারের সদস্যা নীলিমা বর্মনের সহযোগিতায় সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। এছাড়াও আবৃত্তি পরিবেশন করেন যথাক্রমে রানী সেন ও স্মৃতি নন্দী এবং সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাংস্কৃতিক শাখার অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক দেবাশিস দত্ত। তৃপ্তি চক্রবর্তী ও রানী সেনকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী সমগ্র কর্মসূচীটি পরিচালনা করেন। আলোচনা সভার উল্লিখিত বিষয়টি জেলার কর্মচারীদের অভ্যন্তরে সাড়া ফেলেছিল। □

নয়া উদারবাদ, বিভেদপন্থা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে চাই সর্বস্তরের শ্রমজীবীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ঃ ডঃ অসীম দাশগুপ্ত

এই বছর ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নস্-এর ডাকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে 'আন-এমপ্লয়মেন্ট' তথা কর্মসংস্থানহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিপালিত হয়েছে 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন ডে'। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন ডব্লু এফ টি ইউ মঞ্চের অন্যতম শরিক। তাই সর্বভারতীয় ফেডারেশনের পক্ষ থেকে রাজ্য ভিত্তিক সংগঠনগুলির কাছে যথোপযুক্ত মর্যাদা ও গুরুত্ব সহ 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকশন ডে' প্রতিপালনের আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানকে সামনে রেখে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে গত ১৬ অক্টোবর ২০১৪ একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। ঐ সভার আলোচক ডঃ অসীম দাশগুপ্ত-র বক্তব্য (প্রথম অংশ)।

আলোচনা সভায় উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী

আলোচনা সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

এই সময়ে পুঁজিবাদী দুনিয়ার প্রত্যেকটি দেশে সব থেকে বড় সমস্যা হল কর্মসংস্থানহীনতা বা বেকারত্বের সমস্যা। আমাদের দেশেও, বিশেষত এই রাজ্যেও এই সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করেছে। পাশাপাশি রয়েছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা ও অন্যান্য সামাজিক সমস্যা। মূল্যবৃদ্ধি হলে প্রকৃত আয় কমে এবং মানুষের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়। কিন্তু কর্মসংস্থানহীনতা বা বেকারত্ব প্রকৃত আয়কে শূন্য করে দেয়। কর্মহীন মানুষের দেশের উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে কোন যোগ থাকে না। আবার যেহেতু উৎপাদন সম্পর্কের মধ্য দিয়েই সামাজিক সম্পর্কগুলি গড়ে ওঠে। তাই তাঁরা সমাজ থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। এই দুটি সমস্যার সাথে যুক্ত হয়েছে জাত-পাত, আঞ্চলিকতাবাদ ও ধর্ম নিয়ে বিভেদ। তাছাড়াও রয়েছে সন্ত্রাস, গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর আক্রমণ। এই প্রত্যেকটি সমস্যার মধ্যে একটা যোগসূত্র রয়েছে। এখন এই সব সমস্যা থেকে বেরোনোর উপায় কি? এই সমাজ ব্যবস্থায়, বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্র কাঠামোয় সমস্যাগুলির সম্পূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু প্রশমন তো করা যায়।

আমাদের সামনে দু'ধরনের পথ রয়েছে। এর একটি হল উদারনীতির পথ। যার পোশাকি নাম দেওয়া হয়েছে আর্থিক সংস্কার বা বিশ্বায়ন। তবে এর বিকল্প পথও রয়েছে। উদারনীতির অর্থ হল মূল আর্থিক সামাজিক কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি হবে বাজার। আবার বাজার কিন্তু স্বয়ম্ভু নয়। বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে তারাই যাদের হাতে সম্পদ বা অর্থ বেশি রয়েছে। যার আর্থিক ক্ষমতা বেশি সে সবসময় চায় সর্বোচ্চ লাভ করতে এবং বাজারকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা হয় সেই লক্ষ্যেই।

উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি বাজারে ওষুধের দাম বাড়াচ্ছে কারা? বড় বাজারের ছোট ওষুধ ব্যবসায়ীরা? না। আমাদের রাজ্য বা অন্য কোন রাজ্যের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা? না। এখন সম্পূর্ণ ওষুধের ব্যবসাকে নিয়ন্ত্রণ করছে কয়েকটি দৈত্যাকৃতি বহুজাতিক সংস্থা। এখন আর দে'জ মেডিক্যালের তৈরী করা কোন ওষুধ বাজারে দেখা যায় না। বেঙ্গল কেমিক্যালস ও প্রায় নেই। একইভাবে সার উৎপাদন ক্ষেত্রটিও প্রায় তাই। কিন্তু এখন এই সমস্ত বহুজাতিক সংস্থাগুলি যে সমস্ত দেশে অবস্থান করে, সেই উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিও সঙ্কটে পড়েছে। বাজার সর্বস্বতার অন্তর্নিহিত কারণেই তাদের এই সঙ্কট। এই প্রসঙ্গে একজন বিশিষ্ট নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ-এর কথা উল্লেখ করব। তিনি হলেন জোসেফ স্টিগলিৎজ্। বিশ্বব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী থেকে পদত্যাগ করেন উদারনীতির বিরোধিতা করে। তিনি সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন 'Price of Inequality' তিনি দেখিয়েছেন গত ২০ বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওপরের ২০ শতাংশ মানুষের আয় বেড়েছে। কিন্তু সাধারণ আমেরিকাবাসীর গড় আয় বৃদ্ধি পায়নি। আই এম এফ, আই এল ও এবং বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদনও একই কথা বলছে। সাধারণ মানুষের আয় না বাড়ার ফলে বাজার সঙ্কুচিত হচ্ছে। কৃষিপণ্য, শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। ফলে বহুজাতিক সংস্থাগুলির নিজেদের দেশে লাভ বাড়ছে না। তখন এদের চোখ পড়ে ভারতের মতন উন্নয়নশীল দেশের বাজারের দিকে।

এই বাজার দখলের নামই আর্থিক সংস্কার। আর্থিক সংস্কার মানে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কারের মতন কোন বিষয় নয়। আর্থিক সংস্কার মানে রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারকে দুর্বল কর, খতম কর।

১৯৯১ সালে ভারত সরকার এই পথ গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ দেশীয় পণ্য দেশের বাজার হারালো, আমদানি বৃদ্ধি পেল। ১৯৯১ সালে আমদানি-রপ্তানির ব্যবধান ছিল ৩,৮০০ কোটি টাকা। এখন ১ লক্ষ কোটি টাকা। গত বছরে আমাদের দেশে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ঋণাত্মক হয়ে গেছিল। বর্তমানে বৃদ্ধির পরিমাণ হয়েছে মাত্র ০.৫ শতাংশ। শিল্পোৎপাদন হ্রাস পাবার ফলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সঙ্কুচিত হল। কৃষিতেও সরকারী নীতির কারণেই বৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে শ্লথ হচ্ছে। সেচ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিষয়টি অবহেলিত হচ্ছে, বাজেট বরাদ্দ হ্রাস পাচ্ছে। পাশাপাশি বাড়ছে সারের দাম। দেশের সার কারখানা বন্ধ করে বাইরে থেকে সার আমদানি করা হচ্ছে। রাসায়নিক সারের দাম ১০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির হার মাত্র দু'শতাংশ। কৃষিতে এই শ্লথতার কারণে, এই ক্ষেত্রেও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়নি।

কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে সরকারী দপ্তরেও। উদারবাদী অর্থনীতির দু'দশকে প্রায় ৩০% কর্মী হ্রাস পেয়েছে। শুধুমাত্র শূণ্যপদ পূরণ করা হচ্ছে না, তা নয়, স্থায়ী পদ অবলুপ্ত করা হচ্ছে। যতটুকু নিয়োগ হচ্ছে তার প্রায় সবটাই হচ্ছে চুক্তি প্রথায়। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা বলছে কাজের নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা চাই। কর্মসংস্থানের গুণমানের হ্রাস পাচ্ছে। এই রাজ্যে এই সমস্ত উপসর্গের সাথে যুক্ত হয়েছে নীতিবিহীন যত্র-তত্র বদলি করা। সংস্কারের ধাক্কা লেগেছে আর্থিক ক্ষেত্রগুলিতেও। যেমন ব্যাঙ্ক ও বীমা। বীমা নিয়ে এখানে আলোচনা করব না। কারণ তাতে অনেকটা সময় লাগবে। তবে ব্যাঙ্ক নিয়ে কয়েকটা কথা বলতে চাই।

১৯৬৯ সালে যখন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয় তখন বামপন্থীরা তাকে সমর্থন করেছিল। ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে এই সময় অগ্রাধিকার ছিল কৃষি ও ক্ষুদ্রশিল্প। উদারবাদী অর্থনীতি চালু হবার পর ব্যাঙ্কিং পরিষেবার সংস্কারের জন্য বেশ কয়েকটি কমিটি গঠন করা হল। যেমন নরসিংহম কমিটি (প্রথম ও দ্বিতীয়), রঘুরাম রাজন কমিটি প্রভৃতি। এই রঘুরাম রাজনই এখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর। এদের মূল সুপারিশগুলি ছিল— ব্যাঙ্কের লক্ষ্য হবে লাভ করা, বেসরকারী ব্যাঙ্কের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। আমাদের দেশে এখন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২২, বিদেশী/বেসরকারী ব্যাঙ্কের সংখ্যা ২৭। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শেয়ার বিক্রী করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু সরকারের শেয়ার ৫১ শতাংশের নীচে নামানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন করেন ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সংগঠনগুলি। ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া ভাল ভূমিকা পালন করেছে। ব্যাঙ্কের অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র এখন পাল্টে গেছে। মোট ব্যাঙ্ক ঋণের ৮৫ শতাংশ মহানগর কেন্দ্রীক। মাত্র ৬ শতাংশ যাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। সারা পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গর হার ১০৮ শতাংশ। আর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির গড় হার মাত্র .৫ শতাংশ। ফলে বেকারত্ব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে রয়েছে মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা। গত দু'তিন বছরে আলুর দাম, চালের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। অথচ কৃষক ফসলের দাম পাচ্ছে না। মাঝে কেউ রয়েছে যারা দাম বাড়াচ্ছে। এটা ছোট ফড়েদের কাজ নয়। আমাদের সময় দেখেছি হুগলী জেলার হিমঘরের মালিকরা বিকেলবেলায় বসে ঠিক করে পরের দিন কলকাতার বাজারে আলুর দাম কত হবে। আমরা এরকম কয়েকজনের বিরুদেধ ব্যবস্থা নিয়েছিলাম, গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। এখন রাজ্য সরকার দাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যে কমিটি তৈরী হয়েছে, তাতে এমন ব্যক্তিদের রাখা হয়েছে, যারা নিজেরাই দাম বাড়াচ্ছে।

অটলবিহারী বাজপেয়ী যখন প্রধানমন্ত্রী তখন মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনার জন্য দিল্লিতে সভা ডাকা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে সভা। এই ধরনের সভায় সবসময় জ্যোতি বসুকে শুরুতেই বলতে বলা হত। জ্যোতি বসু সেই সভায় প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আপনারা অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন শিথিল করলেন কেন? কেন গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙ্গে ফেলা হল?

আমরা হিসেব করে দেখেছি এপিএল, বিপিএল নির্বিশেষে ২ টাকা কিলো দরে ৩৫ কেজি খাদ্য শস্য প্রতিটি পরিবারে পৌঁছে দিতে, বাজেটে এই খাতে যা বরাদ্দ করা হচ্ছে, তার সাথে আর অতিরিক্ত ৫০,০০০ কোটি টাকা লাগবে এবং চাল গমের দাম কমলে অবধারিতভাবে অন্য জিনিসের দাম কমবেই। কিন্তু এই ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। কারণ মূল্যবৃদ্ধি মানে ব্যবসায়ীদের লাভ। ডাইরেক্ট ক্যাশ ট্রান্সফারের যে কথা বলা হচ্ছে তাতে মূল্যবৃদ্ধি কমবে না। বরং এই খাতে সরকারকে ক্রমশ অতিরিক্ত বরাদ্দ করতে হলে একসময় তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। লাতিন আমেরিকার দেশগুলি কিন্তু এই পথে হাঁটছে না। উদারনীতির আক্রমণের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভেদপন্থা। জাত-পাত, ধর্মের নামে। উদারনীতি ও বিভেদপন্থা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। পাশাপাশি সন্ত্রাস, পরিচিতি স্বত্ত্বার বিপদ। **(অনুলিখন-সুমিত ভট্টাচার্য)।**

(পরবর্তী অংশ পরের সংখ্যায়) □

পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর)

বৃহৎ পুঁজিপতিদের নেতৃত্বাধীন একটি বুর্জোয়া জমিদার রাষ্ট্রে পরিকল্পনা গ্রহণে এই রাজনৈতিক সদিচ্ছা আশা করা যায় না।

চার

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উপর বড় ধরনের আঘাত নেমে আসে ১৯৯১ সালে নরসিমা রাও -ডঃ মনমোহন সিং ক্ষমতাসীন হওয়ার পর। ১৯৯১ সালের মাঝামাঝি জাতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারীকরণ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের উদারীকরণের মধ্য দিয়ে নব্য উদারনীতি গৃহীত হয়। এই নীতির মূল কথা হল বাজার সর্বস্বতা। ফলে সরকারী ক্ষেত্রের পরিবর্তে বেসরকারী ক্ষেত্রের উপর গুরুত্ব বেশি বেশি করে অর্পিত হয়। সরকারের ভূমিকার লঘুকরণের মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির স্বরূপ পূর্বের থেকে অনেকটাই পাল্টে যায়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৩ থেকে ১৯৯৬-৯৭) এর স্পষ্ট আভাষ পাওয়া যায়। বিশেষত কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনার বদলে বিকেন্দ্রীকৃত পরিকল্পনার প্রবণতা বৃদ্ধির পাশাপাশি পূর্বের তুলনায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনেক বেশি (Indicative) ইঙ্গিতবাহী করা হয়। এক কথায় বলা চলে যে, এই সময়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকে মাথা থেকে নামিয়ে এনে বাজারের ভূমিকাকে সর্বোচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বস্তুতপক্ষে অষ্টম পরিকল্পনার পর নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হলেও, অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকাল থেকেই এর অন্তর্জলীযাত্রা শুরু হয়। আর এই যাত্রায় নতুন গতি সৃষ্টি করে দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইভলিউশন অফিস (আই ই ও) গঠনের সিদ্ধান্ত। ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই সংস্থাটি গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচীগুলি ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচীর স্বাধীনভাবে পর্যালোচনা করা। ২০১০ সালে সংস্থাটি গঠিত হলেও ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এর ডি জি নিয়োগের মধ্য দিয়ে কাজ শুরু করে। গত ২৩ জুন এই সংস্থার ডি জি অসিত ছিব্বার প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেন। এর অন্যতম সুপারিশ ছিল পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে রিফর্ম অ্যান্ড সলিউশন কমিশন গঠন করা যা সরকারের চিন্তার আধার (থিঙ্ক ট্যাঙ্ক) রূপে কাজ করবে। অপর একটি সুপারিশ হল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের অধীনে একটি পরিকল্পনা মন্ত্রক স্থাপন, যার দায়িত্ব হবে বিভিন্ন মন্ত্রকের মধ্যে মূলধনীব্যয় বণ্টন করা। ফ্রন্টলাইন (সেপ্টেম্বর ৬-১৯) পাক্ষিকের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি ঘোষণা করেছেন যে "পরিকল্পনা কমিশন এখন উন্নয়নের সহায়কের পরিবর্তে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে অসিত ছিব্বার কর্মজীবনের দীর্ঘ ২৫ বছর বিশ্বব্যাঙ্কে কাটিয়েছেন। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা যে আই ই ও-র রিপোর্টকে হাতিয়ার করে নরেন্দ্র মোদী পরিকল্পনা কমিশনের মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়েছেন।

পাঁচ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যের পাশাপাশি ব্যর্থতাও আছে; এই ব্যর্থতার কারণ নির্দিষ্ট করে তা দূর করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু পরিবর্তে পরিকল্পনার ধারণাটিই পুরোপুরি বাতিল করে দেওয়ার অর্থ হল 'ময়লা জল সহ শিশুকে নর্দমায় নিক্ষেপ করা'। পরিকল্পনা কমিশন বাতিলের সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেশ কিছু শূন্যতা সৃষ্টি হবে। যেমন বর্তমানে ১৪৭টি কেন্দ্রীয় অনুমোদিত প্রকল্প আছে। বি কে চতুর্বেদী কমিটি তা হ্রাস করে ৫৯টি করার প্রস্তাব করেছে। এসব প্রকল্পের ভবিষ্যত কি? তাছাড়া বর্তমান বছরটি দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার তৃতীয় বর্ষ। পরিকল্পনা কমিশনের কোনো ডেপুটি চেয়ারম্যান নেই। আগামী বছরের (১৫-১৬) রাজ্যগুলির বার্ষিক পরিকল্পনার উপরে চলতি বছরের শেষ দিক থেকে আলোচনা শুরু হবে। কি হবে তার ভবিষ্যৎ? বর্তমান কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের প্রশ্নে সাংবিধানিক সংস্থা অর্থ কমিশন এবং পরিকল্পনা কমিশন রয়েছে। রাজ্যগুলির রাজস্ব ঘাটতি পুরণে আর্থিক সহায়তা প্রদানে অর্থ কমিশন রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব বণ্টন করে। ১৯৬৯ সালে নির্ধারিত গ্যাডগিল ফর্মুলা অনুযায়ী এই বণ্টন প্রক্রিয়া শুরু হয়। ১৯৯০-এর দশকে এটি সংশোধিত হয়ে গ্যাডগিল-মুখার্জী (প্রণব মুখার্জি) ফর্মুলায় রূপান্তরিত হয়। বর্তমানে চতুর্দশ অর্থ কমিশন কাজ করছে। ২০১৫-১৬ সালে এর সুপারিশ কার্যকর হবে। পরিকল্পনা কমিশন রাজ্যগুলিকে পরিকল্পনা বাবদ

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমে)

নব্য উদারনৈতিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে ভারতে কৃষক আত্মহত্যার একটি ময়না তদন্ত

প্রণব কর

২০০৬ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিং লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশ্যে যে ভাষণ দিচ্ছিলেন সেখানে মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের কৃষকদের দুঃখকষ্টের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন যে সেখানকার কৃষকদের কষ্ট তার মধ্যে গভীর প্রভাব ফেলেছে। বিপুল ঋণের বোঝা বইছেন যেসব কৃষকেরা তাদের কষ্ট সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। প্রায় একই সময়ে ভারত সরকারের কৃষিমন্ত্রী শরদ পাওয়ার, যিনি মহারাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও বটে, তাকে দেখা গেল টেলিভিশনে দর্শকদের আশ্বস্ত করছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের নিরাপত্তা সম্পর্কে যারা তখন শ্রীলঙ্কায় সফররত রয়েছেন। ভারতীয় রাজনীতির এই বৈপরীত্যটা একদিকে যেমন তীব্র কৌতুকবহ তেমনই একইসঙ্গে ভারতীয় কৃষকদের সঙ্কটের দ্যোতক হিসেবে দেখানো যায়। ভারতীয় কৃষকদের যন্ত্রণা সম্বন্ধে ঘটা করে দুঃখপ্রকাশ চলছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনো বহিঃপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে না— এটাই বাস্তব চিত্র। এর ফলে ভারতবর্ষের কৃষকদের মধ্যে ব্যাপকহারে যে আত্মহত্যার প্রবণতা তৈরি হয়েছে তার ফলে ভারতবর্ষ বর্তমান পৃথিবীর সুইসাইড ক্যাপিটাল বা আত্মহত্যার রাজধানী বলে চিহ্নিত হচ্ছে।

২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে ভারতের প্রখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ এম এস স্বামীনাথনের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম 'ন্যাশনাল কমিশন ফর ফার্মার্স'-এর পঞ্চম এবং সর্বশেষ রিপোর্টে ভারতীয় কৃষির সঙ্কটের যে কারণগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি হল— ১। অসম্পূর্ণ ভূমি সংস্কার, ২। অপর্যাপ্ত পরিমাণে এবং নিম্নমানের সেচ ব্যবস্থা, ৩। প্রযুক্তিগত শৈথিল্য, ৪। প্রয়োজনমতো এবং সময়মতো প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের অভাব, ৫। সঠিক মূল্যে পণ্যকে বাজারজাত করার সুযোগের অভাব। এছাড়াও প্রতিকূল আবহাওয়া ভারতীয় কৃষির পক্ষে একটি ক্ষতিকারক দিক। এই দুর্বলতাগুলি দূর করতে কৃষিক্ষেত্রে সরকারের আরও জোরালো উপস্থিতিই একমাত্র পথ। অথচ ২০০০ সালের ২৮ জুন ভারত সরকার যে 'জাতীয় কৃষি নীতি' ঘোষণা করে সেখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে— বেসরকারী উদ্যোগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়েই কৃষিতে বৃদ্ধি ঘটানোর পরিকল্পনা করবে সরকার। এই বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হবে চুক্তি প্রথায় চাষ এবং লিজে জমি দেবার মাধ্যমে। এছাড়াও অনেক গালভরা কথা বলা হলেও মোদ্দা কথাটি হল সরকার কৃষিক্ষেত্র থেকে হাত গুটিয়ে নেবে এবং তার স্থান দখল করবে বেসরকারী পুঁজি। ফলে এম এস স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশগুলি ফাইলবন্দী হয়ে পড়ে থাকে অথচ সরকার কৃষিক্ষেত্রে কর্পোরেট পুঁজির প্রবেশের পথ সুগম করতে পি পি পি মডেলের প্রস্তাব পেশ করে।

গত ২০১২ সালের ডিসেম্বরে সি আই আই কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে একটি জাতীয় সভার আহ্বান করে। এই সভার উদ্বোধন করতে এসে রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জী পি পি পি মডেল প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষিতে 'দ্বিতীয় সবুজ বিপ্লব' সম্পন্ন হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এই মডেলকে কার্যকর করবার জন্য রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে কৃষকদের সমবেত করে এবং কৃষিপণ্য সরবরাহ লাইনকে সংযুক্ত করে বেসরকারী ক্ষেত্রের প্রযুক্তিগত এবং ম্যানেজারিয়াল দক্ষতাকে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। আসলে এর মধ্য দিয়ে চুক্তি প্রথায় চাষকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই ১৭টি রাজ্য সরকার

২৫টি কর্পোরেট সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—রিলায়েন্স, প্রসার ভারতী এন্টারপ্রাইজ, দেল মন্তে প্যাসিফিক লিমিটেড, আদানী গ্রুপ, আই টি সি, গোদরেজ, মারিকো, টাটা কেমিক্যাল এবং নেসলে। অথচ পূর্ব অভিজ্ঞতায় বারে বারে দেখা গেছে যে চুক্তি প্রথায় উৎপাদনের ক্ষেত্রে কৃষকদের উৎপাদনগত ও বাজারগত ঝুঁকির মধ্যে পড়তে হয়। বিশেষত বাজারে পণ্যের দাম বা চাহিদা পড়ে গেলে পণ্যের গুণমানের অছিলা দেখিয়ে কম দামে বা কম পরিমাণে জিনিস কেনার রেওয়াজ চালু রয়েছে। ফলে একদিকে কৃষিক্ষেত্র থেকে সরকারের হাত গুটিয়ে নেওয়া, অন্য দিকে কৃষিপণ্যের বাজারে কর্পোরেট সংস্থার বর্ধিত উপস্থিতি এই দুইয়ের মাঝে পরে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সঙ্কট বৃদ্ধি পেয়েছে বহু গুণ।

এছাড়াও অন্য যেসব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে ভারতীয় কৃষকেরা দিন অতিবাহিত করেন সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল—

১। সরকারী ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে অসুবিধা, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকেরা মোট কৃষক সংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশ হলেও ২০১১ সালে মোট কৃষিঋণের মাত্র ৪৮ শতাংশ পেয়েছেন তারা।

২। বর্তমানে শস্যবীমা করার জন্য আই সি আই লোম্বার্ড, এইচ ডি এফ সি এরগো, টাটা-অ্যালায়েঞ্জ ইত্যাদি বীমা কোম্পানিগুলিকে নিযুক্ত করা হয়েছে, যাদের কাছ থেকে বীমা আদায় করা অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৩। ইউ পি এ এবং বি জে পি উভয় দল মিলেই জমির উর্ধ্বসীমা আইন লঘু করে ফেলায় অনেক ক্ষেত্রেই ভূমি সংস্কারের সুফলগুলি নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। কৃষি সংকট বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেক কৃষকই তার জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন এবং বড় বড় সংস্থাগুলি তা কিনে নিচ্ছে।

৪। গত ৪ বছরের মধ্যে সারের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যুৎ ও ডিজেলের ব্যাপক দাম বৃদ্ধি সেচের জলকেও মহার্ঘ্য করে তুলেছে।

৫। এম এস স্বামীনাথন প্রস্তাব দিয়েছিলেন যে কৃষিপণ্যের ক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পণ্য উৎপাদন মূল্যের সঙ্গে তার ৫০ শতাংশ যোগ করে তৈরি করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে অনেকক্ষেত্রে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পণ্য উৎপাদন মূল্যের থেকেও কম হচ্ছে। এমনকি কোনো কোনো রাজ্যে খাদ্যশস্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সংগ্রহ পর্যন্ত হচ্ছে না।

৬। কৃষিক্ষেত্রে সরকারী বিনিয়োগ দ্রুত হারে কমছে। ২০০৯-১০ সালে যেখানে কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ ছিল জি ডি পি-র ১.১ শতাংশ তা ২০১২-১৩-তে কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র .৭ শতাংশ।

৭। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ এবং অরণ্য মন্ত্রক গত লোকসভা নির্বাচনের ঠিক আগেই মনসান্টো কোম্পানীকে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড শস্য ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছে। মহারাষ্ট্রের তুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে এইরকম জেনেটিক্যালি মডেফায়েড বিটি তুলো চাষ করে বিপর্যয় নেমে এসেছে। বিদর্ভ অঞ্চলের কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সরকার এখনও বীজ ব্যবহারের জন্য জোরালো প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

৮। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষেত্রে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পাওয়া আজও দুরূহ ব্যাপার, ফলে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রামীণ মহাজনদের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া হারে ঋণ গ্রহণ করে। চড়া সুদের হারের জন্য অধিকাংশ কৃষকই ঋণের জালে জড়িয়ে পড়েন এবং তা থেকে মুক্তির জন্য আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হন। প্রথম ইউ পি এ সরকার তার মেয়াদের শেষের দিকে ঋণ মকুবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষেত্রে তা কোনো বার্তা বহন করেনি, কারণ তাদের অধিকাংশই সরকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ঋণ পেত না, গ্রামীণ মহাজনদের কাছেই তাদের সর্বস্ব বাধা থাকত।

৯। যেসব ফসল দেশে উৎপন্ন হচ্ছে তা বেশি বেশি করে আমদানি করে চাষিদের আরও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মার্কিন তুলো উৎপাদনের ক্ষেত্রে কেজি প্রতি খরচ ৭৯.৯০ টাকা তা আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি হয় ৫৫.৪০ টাকায়। সেই লোকসান পুষিয়ে দিতে আমেরিকার ২০ হাজার তুলো চাষিকে ভরতুকি দেওয়া হয় ২০ হাজার কোটি টাকা, অর্থাৎ তুলো চাষি প্রতি ভরতুকির পরিমাণ ১ কোটি টাকা। এই ভরতুকিপ্রাপ্ত তুলো ভারতের বাজারে এসে ভারতীয় তুলো চাষিদের বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে, অথচ সরকার তাদের ন্যূনতম সাহায্যও করছে না।

এইরকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে দাড়িয়ে ভারতীয় কৃষকদের আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনো পথ খোলা থাকছে না। ১৯৯৬ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত ভারতবর্ষে মোট ২,৮৪,৬৯৪ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছে। অর্থাৎ প্রতি ঘণ্টায় দুজন করে কৃষক আত্মহত্যা করেছেন।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর সর্বশেষ রিপোর্টে আত্মঘাতী মানুষের পেশাভিত্তিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যাচ্ছে কৃষির সঙ্গে যুক্ত মানুষই সবচেয়ে বেশি আত্মহত্যা করছেন। শতাংশের হিসেবে এটি ১১.৯ শতাংশ। ২০০৮-এর আত্মঘাতী কৃষকের সংখ্যা ছিল ১৬,১৯৬ জন। ২০০৯-এ ১৭,৩৬৮ জন এবং ২০১০-এ ১৫,৯৬৪ জন। কেন্দ্র ও রাজ্যের ভ্রান্ত কৃষিনীতির জন্য ভারতবর্ষের অন্যতম ধনী রাজ্য মহারাষ্ট্রে ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১৩ পর্যন্ত মোট কৃষক আত্মহত্যা করেছেন ৬০,৭৫০ জন।

ক্রমবর্ধমান উৎপাদন খরচের পাশাপাশি ফসলের ন্যায়সঙ্গত দাম না পাওয়া কৃষকদের ঋণের বোঝা ক্রমাগত বাড়িয়েছে। ঋণ শোধ করতে না পেরে আত্মহত্যা করার সংখ্যা ১৯৯৭ সাল থেকেই বাড়তে থাকে। ২০০০ সালে তা মহামারীর চেহারা নেয়। প্রধানত অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ—এই পাচটি রাজ্যে গণহারে আত্মহত্যা ঘটতে থাকে। প্রথমে অন্ধ্রপ্রদেশে এই সংখ্যা সব থেকে বেশি ছিল, পরে মহারাষ্ট্রে তা ভয়াবহ আকার গ্রহণ করে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ অঞ্চলের তুলো ও আখ চাষিরা আত্মঘাতী হতে থাকেন ঋণের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে।

আমরা যে কালপর্বের কথা এখানে আলোচনা করছি সেই পর্বে কেন্দ্রে সরকার পরিচালনা করেছে কংগ্রেস, বি জে পি এবং তাদের সহযোগী শক্তি তৃণমূল কংগ্রেস, এই পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত হয়েছে নব্য উদার অর্থনীতি দ্বারা।

পাশাপাশি আমরা যদি আমাদের রাজ্যের দিকে তাকাই

(সপ্তম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে)

পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তি

(পঞ্চম পৃষ্ঠার পর)

অর্থ বরাদ্দ করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের এই দায়িত্ব কে নেবে? অর্থকমিশন? সেক্ষেত্রে অর্থ ভাগাভাগির সূত্র কি হবে? পরিকল্পনা কমিশন নির্ধারিত ১১টি (উত্তর পূর্বাঞ্চলের ৮টি রাজ্য ও হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, জম্মু-কাশ্মীর) বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন রাজ্য আছে যারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা তহবিলের ৩০ শতাংশ পায়। এরপর কি হবে? এইসব প্রশ্নকে বিবেচনার মধ্যে এনে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধী সঠিকভাবে বলেছেন ''যোজনা কমিশনের অবলুপ্তি ঘটিয়ে ঘড়ির কাঁটাকে যেন পিছন দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হল। আঘাত করা হল ভারতের যুক্তরাষ্ট্রের ধারণার মূলেও। যোজনা কমিশন সরকারের কাজের মূল্যায়ন ও সমালোচনা করার একটি মাধ্যম ছিল। দুর্বল এবং সবলের মধ্যে, কেন্দ্র এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ল।'' (দ্য হিন্দু ২৯ আগস্ট)

এসব জটিলতার সম্ভাবনা প্রধানমন্ত্রী জানেন না, তা নয়। তা সত্ত্বেও কেন এই সিদ্ধান্ত। আসলে এর মূল কারণ দায়বদ্ধতা। দেশ-বিদেশের বৃহৎ পুঁজিপতিদের দাক্ষিণ্যে প্রধানমন্ত্রী হওয়া থেকে তৈরি হয়েছে এই দায়বদ্ধতা অর্থাৎ বাজার মৌলবাদের সামনে কোনওরকম প্রতিবন্ধকতাই বাজার মৌলবাদীরা বরদাস্ত করতে রাজি নয়।

একই কারণে শ্রম আইন সংস্কারের নামে গুরুত্বপূর্ণ শ্রম আইনগুলি সংশোধনের নামে মালিক পক্ষের হাতে অবাধে হায়ার অ্যান্ড ফায়ার এর অস্ত্র তুলে দেওয়া হচ্ছে। বাজার মৌলবাদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই রেলে বিদেশি পুঁজি, বীমা ও প্রতিরক্ষায় বিদেশি পুঁজির উর্ধ্বসীমা ২৬ শতাংশ থেকে ৪৯ শতাংশে উন্নীত করা, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার শেয়ার বিক্রী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেসরকারী করণের সিদ্ধান্ত প্রভৃতি গৃহীত হয়েছে। এই একই দায়বদ্ধতা থেকেই পরিকল্পনা কমিশনের অবলুপ্তির ঘোষণা।

দ্বিতীয়ত, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার গায়ে যখন সমাজতন্ত্রের গন্ধ আছে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে যখন নেহেরু যুগের সম্পর্ক রয়েছে, তখন এর অস্তিত্বকেই স্বীকার করতে চাইলেন না প্রধানমন্ত্রী। এই দায়বদ্ধতা থেকে শুধু পরিকল্পনা কমিশনকে তুলে দেওয়া নয়। আসলে এর মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসকেই অস্বীকার করতে চাওয়া হয়েছে এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কারণ বিজেপি-র ঠাকুরদাদা হিন্দু মহাসভা বা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ কেউই স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। সুতরাং ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদও নেই।

পূর্বোক্ত প্রেক্ষাপটে একথা বলা চলে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের অদ্ভুত ফরমানের বিরুদ্ধে লড়াইকে আগলে নিয়ে আরও জোরদার করা বিশেষ জরুরী হয়ে পড়েছে। □

চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল মস্তিষ্কের রহস্যভেদ

ছোট্ট একটি শব্দ— জি পি এস, পুরো কথা— গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম। ১৯৭৩ সালে কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্য নিয়ে এই প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছে মানুষ। জি পি এস ট্র্যাকারের সাহায্যে স্থান-কাল-পাত্র-আবহাওয়া সহ সব খবরই এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের মস্তিষ্কের জি পি এস-এর কার্যকলাপ (!) জানতে আরও বহু সময় আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। মস্তিষ্কের এই জটিল রহস্য ভেদ করেই এবছরের চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন ব্রিটিশ-মার্কিন গবেষক জন ওকিফ এবং নরওয়ের বিজ্ঞানী দম্পতি মে-ব্রিট মোসের ও এডওয়ার্ড মোসের। কোনও ব্যক্তি কোথায় রয়েছেন, কোথায় যেতে চান, তিনি কী করছেন— সারাদিনের এইসব খুঁটিনাটি বিষয় মানুষ কীভাবে মনে রাখে— তারই প্রকরণ পদ্ধতির জবাব দিয়েছেন এই তিনজন। বিজ্ঞানীদের আশা— এই আবিষ্কার ভবিষ্যতে অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের চিকিৎসায় প্রভূত সাহায্য করবে।

আমাদের মস্তিষ্কের অভ্যন্তরস্থ দু'টি হিপ্পোক্যাম্পাস স্মৃতিকে বেঁধে রাখার কাজ করে। 'এনটোরিনাল কর্টেক্স' নামে আর একটি অংশ হিপ্পোক্যাম্পাসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। মস্তিষ্কের এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ অংশের একসূত্রে কাজ করার পদ্ধতিকেই ব্যাখ্যা করেছেন ওকিফ এবং মোসের দম্পতি। রহস্যভেদের প্রথম ধাপটি কিফ পেরোন ১৯৭১ সালে। হিপ্পোক্যাম্পাসের ভিতরে 'প্লেস সেলস' নামে বেশ কিছু পিরামিড আকৃতির স্নায়ুকোষের সন্ধান পান তিনি। প্রাথমিকভাবে ইঁদুরের উপর গবেষণা ক'রে তিনি দেখেন যে, ইঁদুরের মস্তিষ্কের প্রতিটি স্নায়ুকোষ প্রাণীটিকে তার আশেপাশের প্রতিটি স্থান পৃথকভাবে চিনিয়ে দেয় এবং একই সাথে তার মাথার মধ্যে পারিপার্শ্বিকের মানচিত্র ফুটিয়ে তোলে।

এই আবিষ্কারের ঘটনার ৩৪ বছর পর ২০০৫ সালে নরওয়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক মে ব্রিট ও এডওয়ার্ড মোসের মস্তিষ্কে 'গ্রিড সেল' নামে অপর এক ধরনের স্নায়ুকোষের সন্ধান পান। এঁরা দুজন দাবি করেন যে, এই গ্রিড কোষের সাহায্যেই সম্মিলিতভাবে থাকা কতকগুলো কোষ ত্রিমাত্রিক দুনিয়ায় প্রাণীটির অবস্থান চিনিয়ে দেয়। তার মাথার মধ্যে গেঁথে যায় ঐ স্থানের সমস্ত স্মৃতি। কোনও গলি, রাস্তা, বন্ধুর বাড়ি একবার চিনে গেলে পরের বার আর আমাদের নতুন ক'রে চিনতে হয় না। স্মৃতিতে গেঁথে যাওয়া রাস্তাঘাটের ছবি অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যাই। বিশেষ বিশেষ স্থান, কাল, পাত্রকে মনে রাখার এই কাজটাই করে গ্রিড সেল। পুরস্কার ঘোষণার পর নোবেল অ্যাসেম্বলির তরফে বলা হয়েছে— ''কী ভাবে মানুষের স্মৃতি তৈরি হয়, পুরনো কথা ছবির মতো তার ভেসে ওঠে মাথায় আর কী ভাবেই বা তা হারিয়ে যায়, এই তিন বিজ্ঞানীর গবেষণা এক দিন সে রহস্যও ভেদ ক'রে দেখাবে।'' □

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

‘কাজ’-এর কার্যকরী সংজ্ঞা নির্ধারণ

বেশ কিছু দিন ধরেই একটি বহুচর্চিত বিষয় হ’ল, ভারতে কর্মজীবী নারীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। কর্মসংস্থান ও কর্মসংস্থানহীনতা প্রসঙ্গে ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অফিস (এনএসএসও)-এর পক্ষ থেকে যে বৃহৎ নমুনা সমীক্ষা করা হয়েছিল, তার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১১-১২ সালের মধ্যে পেশাগত বৃত্তে নারীদের অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। গ্রামাঞ্চলে এই সংখ্যা নেমে এসেছে ৩৩.৩ শতাংশ থেকে ২৫.৩ শতাংশে এবং শহরাঞ্চলে ১৬.৬ শতাংশ থেকে ১৪.৭ শতাংশে। অন্যান্য দেশের তুলনায় (উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয়ই) এই হার যথেষ্টেই কম। শুধু তাই নয়, আরও একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় হ’ল এক বা একমাত্র ভারতীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখা যাচ্ছে, তাহল মোট জাতীয় আয় দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পেশাগত বৃত্তে নারীদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাবেই। এই অদ্ভুত বৈশিষ্টের কারণ হিসাবে বহু ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শোনা যাচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটি আংশিক যুক্তি হল তরুণী ও যুবতীদের মধ্যে (১৫-২৪ বয়স সীমা) লেখা-পড়া শেখার ঝোঁক বাড়ছে বলেই কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ কমছে। এটা যদি সত্যি হয় তাহলে খুব ভাল কথা। কিন্তু এটা বলে হ্রাস প্রাপ্তির যে হার তার সবটা ব্যাখ্যা করা যাবে না। আর একটি জোরালো ব্যাখ্যা হল, প্রকৃত মজুরির হার বৃদ্ধি পাবার ফলে বহু মহিলাই এখন কম মজুরিতে প্রচন্ড শারীরিক পরিশ্রম আর ফাই-ফরমাস খাটার কাজ করতে চাইছেন না। তার বদলে তাঁরা বেশী সময় দিচ্ছেন বাড়ীতে পরিবারের প্রয়োজনে। এই যুক্তির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল, দরিদ্রতর ঘরের মহিলারাও এখন একটু সুযোগ পেলেই আর বাইরে কাজ করতে চাইছেন না।

কিন্তু অধিকাংশ যুক্তি তর্ক বিশ্লেষক যে বিষয়টিকে এড়িয়ে যাচ্ছেন, তা হল— নারীরা যে বিভিন্ন ধরনের কাজের সাথে যুক্ত তার সবটা জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় ধরা পড়ে না। সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়াতো দূরের কথা।

অধিকাংশ অভিধান অনুযায়ী ‘কাজ’ -এর অর্থ হল, কোন না কোন ফলের আশায় শারীরিক বা মানসিক প্রচেষ্টা। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সংজ্ঞা আরও সংকীর্ণ— সমাজের সর্বস্তরে পণ্য ও পরিষেবার উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের ব্যবস্থাপনায় যুক্ত যে কাজ। অবশ্য এই সংজ্ঞার অনিবার্য প্রশ্নটি হল পন্য ও পরিষেবা বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে। উপরোক্ত সংজ্ঞার সূত্র ধরে একথা বলা যায়, যে কোন কার্মকাণ্ড যা অপর কাউকে অর্পণ করা যায়, হল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভোগ ও বিশ্রাম ব্যতিরেকে সবটাই হল অর্থনৈতিক কর্মকান্ড। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এই বৃহত্তর তাৎপর্যটি অনুধাবন করা প্রয়োজন।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাতৃত্বকালীন যে দায়িত্ব তা সাধারণভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নয়। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে কখনও কখনও কোন সেবিকাকে মজুরির বিনিময়ে শিশুকে স্তন্য পান করানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়। তখন এই কাজটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পর্যবসিত হয়। বর্তমান সময়ে আর একটি প্রাসঙ্গিক উদারহণ হল, ‘সারোগেট’ মা। সেখানে মজুরির বিনিময়ে একজন নারী অপরের সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং সন্তানের জন্ম দেয়। এই ভাবে যে উপার্জন নারীরা করেন তাও কিন্তু মোট জাতীয় আয়ে যুক্ত হয়। এতদসত্ত্বেও একই কাজ যখন কোন নারী নিজের সন্তানের জন্য করেন এবং যার বিনিময়ে তিনি কোন মজুরি পান না, তখন বলা হয় তিনি শ্রমজীবীদের বাহিনীর সদস্য নন।

অপরদিক হল ‘কাজ’-এর সংজ্ঞা নির্ধারণে অবশেষে একটি বাস্তবোচিত আন্তর্জাতিক মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়েছে। ২০১৩ সালের নভেম্বর মাসে শ্রম পরিসংখ্যানবিদদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যা আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা মার্চ ২০১৪-য় অনুমোদন করে) নির্ধারিত ‘কাজ’-এর নতুন সংজ্ঞা হল — ‘লিঙ্গ ও বয়স নির্বিশেষে যে কোন ব্যক্তি নিজের বা অপরের

প্রয়োজনে পণ্য উৎপাদন ও পরিষেবা প্রদানের জন্য যে ভূমিকা প্রতিপালন করে তাই হল ‘কাজ’। ‘নিজের বা অপরের প্রয়োজনে’ এই শব্দবন্ধটি যুক্ত হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মধ্য দিয়ে নিজের প্রয়োজনে বা পরিবারের প্রয়োজনে পণ্য ও পরিষেবা যোগানোকে যুক্ত করে নেয়া হয়েছে। এই সংজ্ঞার বিভিন্ন দিক লক্ষ্মণীয়। প্রথমত প্রথাগত, প্রথাবহির্ভূত, আইনানুগ ইত্যাদি বিষয়ে নির্বিশেষে কাজের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত যে সমস্ত কর্মকাণ্ড পণ্য ও পরিষেবা উৎপাদন করে না (যেমন ভিক্ষা করা বা চুরি করা), আত্ম-যত্ন (যেমন নিজের পরিচর্যা ও স্বাস্থ্য) এবং যা একজনের হয়ে আর একজন করে দিতে পারে না (যেমন ঘুমানো বা লেখা পড়া করা), সেগুলিকে ‘কাজ’-এর সংজ্ঞা থেকে বিযুক্ত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞার তাৎপর্য হল, এর ভিত্তিতে যে কোন অর্থনৈতিক এককের অভ্যন্তরেই ‘কাজ’ করা যায়। সুতরাং কর্মসংস্থান যা সংজ্ঞায়িত হয়েছে মজুরি ও মুনাফার জন্য কাজ হিসেবে- তা বৃহত্তর ‘কাজ’-এর অন্তর্ভুক্ত বিভাগ মাত্র।

‘কাজ’ সম্পর্কিত এই নতুন বা বর্ধিত সংজ্ঞা আমাদের দেশে ‘কাজ’-এর স্বীকৃতি প্রদানের দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিমাপন পদ্ধতি উভয়েরই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটাবে। যেহেতু আমাদের দেশের মুখ্য পরিসংখ্যানবিদ ঐ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন বলে আশা করা যায়, আমাদের দেশে তথ্য ও পরিসংখ্যান উপস্থাপনার যথোপযুক্ত পরিবর্তন সাধিত হবে।

যাই হোক বর্তমানে আমাদের দেশের এন এস এস ও ‘কাজ করছেনা বা ‘কাজের জন্য পাওয়া যাচ্ছে না’ শীর্ষক একটি বিভাগ তৈরি করেছে যেখানে নিম্নলিখিত কোডগুলি রয়েছে ঃ ৯১ ঃ যারা বিদ্যালয়ে গেছেন

৯২ ঃ যারা শুধু গৃহস্থালীর কাজ করেছেন।

৯৩ ঃ যারা গৃহস্থলীর কাজ করেছেন বা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেছেনে (যেমন বাজার করা, গবাদি পশুকে খাওয়ানো, পরিবারের প্রয়োজনে দর্জি বা সেলাই-এর কাজ)

৯৪ ঃ সঞ্চিত অর্থের সুদে বা পেনশনে যাদের দিনগুজরান হয়,

৯৫ ঃ শারীরিক অক্ষমতার জন্য কাজ করতে না পারা

৯৭ ঃ অন্যান্য (যেমন ভিক্ষুক, গণিকা ইত্যাদি)

৯৮ ঃ অসুস্থতার জন্য কাজ করতে না পারা (শুধুমাত্র ঠিকা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে)

৯৯ ঃ ০-৪ বছর বয়স সীমার শিশুরা এই বিভিন্ন গ্রুপ নির্ধারণ এন এস এস ও-র মতে যারা কাজ করছে না এবং শ্রমবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত নয়— যথেষ্ট গোলমেলে। বিশেষত আন্তর্জাতিক পরিসংখ্যানবিদরা ‘কাজ’ এর যে নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তার সাথে বহু বিষয়ে সঙ্গতি পূর্ণ নয়। নতুন সংজ্ঞার ভিত্তিতে উপরোক্ত ৯২, ৯৩ এবং ৯৭ নং কোডের অর্থই পরিবর্তিত হয়ে যাবে।

নতুন সংজ্ঞার ভিত্তিতে বিচার করলে দেখা যায় শ্রমবৃত্তে নারীদের অংশগ্রহণ পুরুষদের তুলনায় বেশী। এমনকি নারীদের অংশগ্রহণের হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও। ২০১১-১২ সালে ৮৬.২ শতাংশ নারী নতুন সংজ্ঞার ভিত্তিতে কোন না কোন কাজে যুক্ত ছিলেন। পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৭৯.৮ শতাংশ। যদিও আমাদের দেশে মনে করা হয় অধিকাংশ নারী কর্মহীন। একটি লক্ষ্মণীয় বিষয় হল বেতন হীন কাজ বা গার্হস্থ কাজ। প্রধানত এই ধরনের কাজে যুক্ত আছেন এমন পুরুষের সংখ্যা ১ শতাংশেরও কম। নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং আমাদের দেশে পেশাগত বৃত্তে নারীদের অংশগ্রহণ কমছে বলে যা বলা হচ্ছে, তা আসলে নারীদের স-বেতন অবস্থান থেকে বেতনহীন ও স্বীকৃতি বিহীন কাজে যুক্ত হওয়ার বর্ধিত প্রবণতা। শহর ও গ্রাম উভয় ক্ষেত্রেই ইহা সত্য। এর পরিণতি হল নারীদের বিক্ষমতায়ন এবং সমাজে তাদের অবস্থান আরও দূর্বল হওয়া। যারা সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন করতে চান তাদের এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে অনুধাবন করা প্রয়োজন।

[সূত্র ঃA definition that works : Jayati Ghosh, Front line, Oct 31, 2014; সংক্ষিপ্ত ভাষান্তর ঃ সুমিত ভট্টাচার্য]

বিভিন্ন রাজ্যের উপনির্বাচন

লোকসভায় ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার ১০০ দিনের মধ্যেই দেশের বেশ কয়েকটি রাজ্যের বিধানসভা ও লোকসভার উপনির্বাচনে বড়সড় প্রত্যাখানের মুখে পড়ল বিজেপি। ৮টি রাজের এই উপনির্বাচনে মোট ৩২টির মধ্যে ১৩টি বিধানসভার আসন খোয়ালো নরেন্দ্র মোদীর দল। নির্বাচনের ফল নিম্নরূপ :

বিধানসভা- ৩২টি আসন

(i) উত্তরপ্রদেশ (১১) — সমাজবাদী পার্টি- ৮, বিজেপি- ৩

(ii) রাজস্থান (৪)— কংগ্রেস- ৩, বিজেপি- ১

(iii) গুজরাট (৯)— বিজেপি- ৬, কংগ্রেস- ৩

(iv) আসাম (৩)— কংগ্রেস- ১, বিজেপি- ১

(v) পশ্চিমবঙ্গ (২)— বিজেপি- ১, টি এম সি- ১

(vi) সিকিম (১)— নির্দল- ১

(vii) অন্ধ্র (১)— টি ডি পি- ১

(viii) ত্রিপুরা (১)— সি পি আই (এম)- ১

লোকসভা- ৩

(i) উত্তরপ্রদেশ (মৈনপুরী)— সমাজবাদী পার্টি

(ii) গুজরাট (বডোদরা)— বিজেপি

(iii) তেলেঙ্গানা (মেডক)— টি আর এস

কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরপরই উত্তরাখণ্ড ও বিহারের উপনির্বাচনে ধাক্কা খেয়েছিল বিজেপি। এবারের উপনির্বাচনে এমনকি নিজের রাজ্যেও ‘ক্লিন সুইপ’’ পাননি নরেন্দ্র মোদী। নিজের কেন্দ্র বারানসীর মধ্যে রোহানিয়া বিধানসভা আসনে শরিক আপনা দল পরাজিত হয়েছে। লোকসভা ভোটে বিজেপি-র পক্ষে বিপুল সমর্থন এসেছিল উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজস্থানে। তিনটি রাজ্যেই একাধিক আসন খুইয়েছে তারা। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং উগ্র হিন্দুত্বের মুখ উমাভারতীর বিধানসভা কেন্দ্র উত্তরপ্রদেশের চারখরিতেও সমাজবাদী পার্টির কাছে হেরেছে বিজেপি। এদিকে ত্রিপুরার বাম প্রার্থী জিতেছেন গতবারের তুলনায় ৫.৮ শতাংশ বেশি ভোট পেয়ে। প্রায় সবকটি রাজ্যেই বিজেপির ভোটে থাবা বসিয়েছে বিরোধীরা, ব্যাতিক্রম পশ্চিমবঙ্গ। রাজ্য বিধানসভায় প্রথম পদ্মফুল ফুটিয়েছেন বসিরহাট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য।

মাত্র একশো দিনেই মোদীর জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়ার কারণ হিসাবে বিভিন্ন রাজনীতিবিদদের মতামত হল, প্রথমত, লোকসভা ভোটে প্রচারের মূল বিষয় ছিল উন্নয়ন, গোবলয়ে এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল উগ্র হিন্দুত্ব। এতে লোকসভায় লেটার মার্কস পেলেও মুজফরনগরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, ‘‘লাভ-জিহাদ’’ বিতর্ক, সর্বোপরি উগ্র হিন্দুত্ববাদী মুখ মোদীর সেনাপতি অমিত শাহ্ ডাহা ফেল করেছেন এই নির্বাচনে। দ্বিতীয়ত, যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকসভায় জিতেছিলেন মোদী, একশো দিনের মধ্যে তা পূরণের কোনো উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়নি। উল্টে শ্রম আইন সংস্কারের মাধ্যমে মালিকপক্ষের হাতে অবাধে ছাঁটাই করার যে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তাতে শ্রমিকশ্রেণীর আস্থা হারিয়েছে বিজেপি। এছাড়া বিরোধীরা বিভিন্ন জায়গায় সমঝোতা করেছেন যেমন বহুজন সমাজবাদী পার্টি উত্তরপ্রদেশে কোনো প্রার্থী দেয়নি। যেভাবে বিহারে লালু-নীতিশ জোট বেঁধেছিলেন। এদিকে মোদীর নিজের রাজ্য গুজরাটের তিনটি আসন হাতছাড়া হওয়ায় যে কথাটা সবচেয়ে বেশি ভাসছে সেটা হল, গুজরাট মডেলের ফানুস ফাটতে শুরু করেছে। ‘‘আচ্ছে দিনের’’ ভাঁওতার জবাব দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। □

মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচন ঃ বিজেপি-র শক্তি বৃদ্ধি পেল

বিগত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের যে অভিমুখ, তারই যেন অনেকাংশে প্রতিফলন ঘটল মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভার নির্বাচনে। কংগ্রেসের শক্তিহ্রাস এবং বিজেপির শক্তিবৃদ্ধি। হরিয়ানায় টানা দশ বছর আর মহারাষ্ট্রে টানা পনেরো বছর সরকার চালানোর পর কংগ্রেসকে প্রত্যাখ্যান করলেন ঐ দুই রাজ্যের নির্বাচকমণ্ডলী। কংগ্রেসের প্রতি মানুষের এই বীতরাগের ফায়দা তুলেছে বিজেপি। তবে হরিয়ানায় একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারলেও (৯০টি আসনের মধ্যে ৪৭টিতে জয়ী), মহারাষ্ট্রে কিছুটা দূরেই থমকে যেতে হয়েছে (২৮৮-র মধ্যে ১২২)। অর্থাৎ একক গরিষ্ঠতা থেকে ঠিক ২৩টি ধাপ দূরে। মহারাষ্ট্রে নির্বাচনী প্রচারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঝাঁপিয়ে পড়েও একক গরিষ্ঠতার ম্যাজিক ফিগারে তাঁর দলকে পৌঁছে দিতে পারেন নি। কিন্তু বিজেপি একক গরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারলেও, গতবারের তুলনায় তার শক্তি অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে (৪৭ থেকে ১২২)। মহারাষ্ট্রে বিজেপির দীর্ঘদিনের সঙ্গী শিবসেনার সাথে এবারের নির্বাচনে জোট হয়নি। দুটি দলই আলাদা আলাদাভাবে লড়ায়, এবারে ঐ রাজ্যের নির্বাচনে কার্যত চতুর্মুখী প্রতিদ্বন্দ্বীতা হয়েছিল। কারণ শারদ পাওয়ারের এনসিপিও কংগ্রেসের সঙ্গ ত্যাগ করেছিল। বিজেপি-শিবসেনা মিতালি অটুট না থাকলেও, ফলাফলের নিরিখে একথা বলা যায় তাতে বিজেপির যেমন ক্ষতি হয়নি, ক্ষতি হয়নি শিবসেনারও। গত নির্বাচনের তুলনায় তাদেরও আসন সংখ্যা ৪৫ থেকে বেড়ে হয়েছে ৬২। এনসিপি পেয়েছে ৪১টি আসন। বিজেপি সরকার গঠন করলে, তাকে বাইরে থেকে নিঃশর্ত সমর্থনের কথা তারা আগ বাড়িয়ে বলেও রেখেছে। যদিও বিজেপির কাছ থেকে এখনও ডাক পায়নি এনসিপি। ফলে শারদ পাওয়ারের ক্ষমতার অলিন্দে টিকে থাকার বাসনা কত দূর ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করছে বিজেপির ওপর। আসলে বিজেপির বহুদিনের সখা শিবসেনার সাথে নির্বাচনের আগে বিচ্ছেদ ঘটলেও, নির্বাচনোত্তর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সেই সম্পর্ক আবার দানা বাঁধতে পারে, এমন সম্ভাবনাই উভয় শিবিরে উঁকি মারছে। কারণ বিজেপিকে সরকার গড়তে হলে কারও না কারও হাত ধরতেই হবে। দুটি বিকল্প তাদের সামনে খোলা রয়েছে। একদিকে এনসিপি, আর একদিকে শিবসেনা। বিজেপির অভ্যন্তরে আলাপ-আলোচনায় শিবসেনাই বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। কারণ তারা পুরোনো বন্ধু এবং মতাদর্শগত দিক থেকেও এই দুটি দলের অবস্থান খুব কাছাকাছি। ফলে এ যাত্রায় শারদ পাওয়ারের মনোবাঞ্ছা পূরণ নাও হতে পারে। মহারাষ্ট্রে কংগ্রেসের যেমন ফলাফল খুবই খারাপ হয়েছে, (৮১ থেকে কমে ৪২), তেমনই ধরাশায়ী হয়েছে রাজ থ্যাকারের শিবসেনা থেকে বেরিয়ে এসে তৈরি করা এমএনএস (১টি আসন পেয়েছে)।

হরিয়ানায় সরকার গঠনের ক্ষেত্রে বিজেপির কোনো সমস্যা না থাকলেও, সমস্যা অন্য জায়গায়। কারণ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী পদের দাবিদার অনেকেই। ফলে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে এই সিদ্ধান্ত নিতে হিমশিম খাচ্ছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। □

কৃষক আত্মহত্যার একটি ময়না তদন্ত

(ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর)

তবে দেখতে পাবো গত সাড়ে তিন বছরে এই রাজ্যে ৯২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। যদিও রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই ঘটনা অস্বীকার করার চেষ্টা করেছে এবং শেষপর্যন্ত মাত্র তিনটি আত্মহত্যার কথা স্বীকার করে। তারা ‘ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো’কে তথ্য পাঠানোও বন্ধ করে দেয়। কিন্তু রাজ্য সরকার ধান ও অন্যান্য শষ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে গড়িমসি করায় এবং সরাসরি সংগ্রহ না করে কল মালিকদের মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করায় কৃষকরা এখন পর্যন্ত ধানের সংগ্রহমাত্রার মাত্র অর্ধেক পরিমাণ সংগৃহীত হয়েছে।

এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন তা হল ত্রিপুরা, কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে যখনই বামপন্থী দলগুলি সরকার পরিচালনা করেছে তখন দেখা গেছে সেখানে কোনো কৃষক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেনি। অর্থাৎ সরকার পরিচালনাকারী দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীটিও এক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
43rd Year 6th Issue, October 2014

Regd. No. : 18484/71
Price : One Rupee

মঙ্গলে সফল অভিযান ও কয়েকটি প্রশ্ন

অবশেষে দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটলো— সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তিতে তৈরী 'মঙ্গলযান' গত বছরের ৫ নভেম্বর যাত্রা শুরু করে পৌঁছে গেল মঙ্গলের কক্ষপথে এ বছরের ২৪ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে এ বড়ো আনন্দের দিন, গর্বের দিন। পৃথিবীতে কোন দেশই পারেনি প্রথম চেষ্টাতেই মঙ্গল অভিযানে সফল হতে, কিন্তু ভারত পেরেছে। বহু বাধা বিপত্তি এসেছে অভিযানের প্রস্তুতির সময়ে কিম্বা তার পরেও, কিন্তু কোনো কিছুই শেষ পর্যন্ত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের অদম্য জেদের কাছে দাঁড়াতে পারেনি। ভারত আজ তাই মহাকাশ গবেষণায় পৃথিবীর প্রথম চারটি দেশের একটি, কারণ সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ছাড়া কোনো দেশই ইতোপূর্বে এ কাজে সফল হতে পারেনি।

বস্তুতঃ, ২০০৮ সালে 'চন্দ্রযান'এর সফল উৎক্ষেপনের পরেই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের মঙ্গল অভিযানের চিন্তা মাথায় আসে। ২০১০ সালে 'ইসরো' (ইন্ডিয়ান স্পেস রিসার্চ অর্গানাইজেশন) ভারত সরকারকে জানায় যে অনুমতি পেলে তারা এই অভিযানের জন্য কাজ শুরু করতে পারে, কারণ ইতোমধ্যেই প্রাথমিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করেই এটা চালানো সম্ভব এবং তার জন্য এখন খাতায় কলমে সম্পূর্ণ প্রস্তুত তারা। ভারত সরকার 'ইসরো'কে প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদান করে ২০১২ সালের ৩ আগস্ট। ৫ আগস্ট থেকেই 'ইসরো' শুরু করে দেয় রকেট তৈরীর কাজ। যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং উৎক্ষেপনকেন্দ্রের প্রয়োজনীয় সংস্কারসাধন সহ সমগ্র প্রক্রিয়ায় মোট খরচ হয়েছে ৪৫৪ কোটি টাকা, যার মধ্যে শুধু রকেটের জন্য খরচ হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা।

'মঙ্গলযান'-এর উৎক্ষেপন হয়েছিল অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্রের ১ নং প্ল্যাটফর্ম থেকে ৫ নভেম্বর ভারতীয় সময় বেলা ২টো ৩৮মিনিটে। প্রথমে ঠিক ছিল যে 'মঙ্গলযান'কে 'জিওসিঙ্কোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' বা 'জিএসএলভি' রকেট দিয়ে উৎক্ষেপন করা হবে, কিন্তু আদতে উৎক্ষেপনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে 'পোলার স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল' বা 'পিএসএলভি'। 'ইসরো' সাধারণত ঃ এই ধরনের রকেটের মাধ্যমে উপগ্রহ স্থাপন করে পৃথিবীর কক্ষপথে। আসলে 'জিএসএলভি' রকেটের মাধ্যমেই এই ধরনের অভিযান চালানো অনেক বেশি বাস্তবসম্মত, কারণ এতে করে সরাসরি মঙ্গলের দিকে অভিযান চালানো যেত। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে 'ইসরো' বাধ্য হয়েছিল সিদ্ধান্তের পরিবর্তন ঘটাতে। বস্তুতপক্ষে ২০১০ সালে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময়ে পর পর দুইবার 'জিএসএলভি' অভিযানের প্রয়োজনীয় মানদণ্ড পেরোতে পারেনি। সে সমস্যা কাটানোর জন্য 'জিএসএলভি'তে ব্যবহৃত 'ক্রায়োজেনিক রকেট' টেকনোলজিকে উন্নত করার প্রয়োজনীয় সময় 'ইসরো'র হাতে ছিল না, কারণ তাতে উৎক্ষেপনের জন্য নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যেত, আর একবার সে সময় পেরিয়ে গেলে ফের উপযুক্ত সময় আসতো আবার ২৬ মাস বাদে অর্থাৎ ২০১৬ সালে, সেটায় না পারলে ফের আবার ২০১৮ সালে। ফলে 'ইসরো' বাধ্য হয় উৎক্ষেপনের মাধ্যম 'পিএসএলভি'তে পরিবর্তিত করতে। ফলে 'মঙ্গলযান'কে আর সরাসরি মঙ্গলের দিকে উৎক্ষেপনের সুযোগ আর থাকেনি, কারণ সে শক্তি পিএসএলভির ছিল না। ঠিক হয়, প্রথমে আর পাঁচটা উপগ্রহের মত 'মঙ্গলযান'কে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হবে, তারপর ধীরে ধীরে তার কক্ষপথ উন্নত করে এক সময়ে রওনা করে দেওয়া হবে মঙ্গলের পথে। ঠিক হয় উৎক্ষেপন হবে ২৮ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে। কিন্তু সে দিনেও উৎক্ষেপন সম্ভব হয়নি। তবে এক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের করার কিছু ছিল না। ১৯ অক্টোবর 'ইসরো'র চেয়ারম্যানকে রাধাকৃষ্ণণ ঘোষণা করেন যে 'মঙ্গলযান'-এর উৎক্ষেপন বাধ্য হয়েই পিছিয়ে দিতে হচ্ছে, কারণ একে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে জাহাজটি প্রশান্ত মহাসাগরের ফিজি দ্বীপপুঞ্জের কাছে থাকার

কথা, সেটি খারাপ আবহাওয়ার কারণে সেখানে পৌঁছাতে পারছে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত প্রাথমিক সব বাধা কাটিয়ে 'মঙ্গলযান' যাত্রা শুরু করে ৫ নভেম্বর এবং পরিকল্পনা অনুযায়ীই উৎক্ষেপনের ৪২ মিনিট পর একে সাফল্যের সাথে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করা হয় এবং ক্রমান্বয়ে সাতবার তার কক্ষপথ উন্নত করে প্রায় মাসখানেক বাদে ৩০ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে তাকে রওনা করে দেওয়া হয় মঙ্গলের দিকে। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণকালে পৃথিবী থেকে এর ন্যূনতম দূরত্ব ছিল ২৬৪.১ কিমি এবং সর্বোচ্চ দূরত্ব ছিল ২৩,৯০৩.৬ কিমি।

পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দূরত্ব ৭৮,০০,০০,০০০ কিমি। এই পথ পার হতে ১৩৫২ কিলোর (এর মধ্যে জ্বালানীর পরিমাণ ৮৫২ কিলো) 'মঙ্গলযান'-এর সময় লাগলো মোট ২৯৮ দিন। অবশেষে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তাকে স্থাপন করা হল মঙ্গলের কক্ষপথে। এর পর থেকে 'মঙ্গলযান' সর্বনিম্ন ৪২১ কিমি এবং সর্বোচ্চ ৭৬,৯৯৩.৬ কিমি দূরত্বে থেকে একে প্রতি ৭২ ঘণ্টা ৫১ মিনিট ৫১ সেকেন্ডে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে। ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলযান তার তোলা প্রথম রঙীণ ছবি পাঠিয়ে দিল ইসরোর সদর দপ্তরে। সফল হল ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন এবং প্রাণান্তকর পরিশ্রম। মঙ্গলের কক্ষপথে স্থাপনের পরেও মঙ্গলযানের সামনে আরও একবার বিপদ হাজির হয়েছিল, যখন জানা গিয়েছিল যে এক বিরাট ধূমকেতু (নাম 'সাইডিং স্প্রিং') তার দিকে ধেয়ে আসছে বিপুল বেগে এবং একে এড়াতে না পারলে যানের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু অভাবনীয় দক্ষতায় ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তাকেও এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। অর্থাৎ প্রক্রিয়ার সব ক্ষেত্রেই তাঁরা সমানভাবে উজ্জ্বল থাকতে পেরেছেন।

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেও কয়েকটি প্রশ্ন করা যেতেই পারে। প্রথমত, বিপুল অর্থ, সময় এবং মেধা ব্যয় করে বিজ্ঞানীরা যে সাফল্য ছিনিয়ে আনলেন, তার থেকে ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ ভারতের নাগরিকদের কি লাভ হল? শুধু গর্ব দিয়ে তো তাঁদের পেট ভরবে না। মনে রাখার দরকার যে, যে সমস্ত দেশ ইতোপূর্বে এ ধরনের অভিযানে সাফল্যলাভ করেছে, তাদের প্রত্যেকেই কিন্তু আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ বলেই পরিচিত, ভারতের মত দরিদ্র নয়। যে দেশের ৭২ শতাংশ মানুষ দৈনিক ২০ টাকার বেশি অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা রাখেন না, যে দেশের নারীদের শুধুমাত্র পানীয় জল সংগ্রহ করতে গিয়ে মাইলের পর মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়, যে দেশের নাগরিকদের এক বিরাট অংশকে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে প্রকৃতির কোলেই আশ্রয় নিতে হয়, শিশু মৃত্যুর হারে যে দেশের অবস্থান এক লজ্জাজনক জায়গায়, সে দেশ শুধুমাত্র 'আমরাও পারি' প্রমাণ করার জন্য এমন বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, তা মেনে নেওয়া যায় কি?

দ্বিতীয়ত, প্রতিটি মহাকাশ অভিযানের শেষেই জনজীবনের উন্নতির পক্ষে কার্যকর কিছু ব্যাপার বিজ্ঞানীরা অর্জন করে থাকেন। মহাকাশ অভিযানের হাত ধরেই আমাদের জীবনে আমরা পেয়েছি ট্রানজিস্টার, পেয়েছি ন্যানো টেকনোলজির কম্পিউটার মায় হালের মোবাইল পর্যন্ত। মাসের পর মাস মহাকাশযানে কম খেয়েও সুস্থ থাকার প্রয়োজনীয়তায় আবিষ্কৃত হয়েছে নানা ধরনের ক্যাপসুল, যা পরে মানুষের দেহগঠণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের এমন বহু গবেষণা আজ মহাকাশে সাধিত হচ্ছে, যা পৃথিবীর মাটিতে করা সম্ভবই হত না। কিন্তু ভারতের এই মঙ্গল অভিযান থেকে এমন কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, কারণ এই অভিযানে 'নতুন' কোনো কিছুই ব্যবহৃত হয়নি। তাহলে এর যৌক্তিকতা কোথায়?

তৃতীয়ত, এই মুহূর্তে মঙ্গলের মাটিতে সরাসরি নেমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছে একাধিক 'রোভার' বা মঙ্গলপৃষ্ঠের যে কোনো তলে চলতে সক্ষম পরীক্ষাযান। অর্থাৎ তাদের সঙ্গে মঙ্গলের সম্পর্ক একেবারে সরাসরি। সেখানে গড়ে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূর দিয়ে পরিভ্রমণকারী মঙ্গলযান নতুন কি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে তা আদৌ স্পষ্ট নয়। তাহলে এমন এক অভিযানে সরকারের সবুজ সঙ্কেত দেওয়ার অর্থ কি, বিশেষ করে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা নিজেরাই যাকে অভিহিত করছেন 'টেকনোলজি ডেমনস্ট্রেটার' বা কারিগরী প্রদর্শনকারী হিসেবে?

আসলে প্রতিবারের মতই দেশের অসাধু রাজনীতিবিদেরা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ব্যবহার করেছেন দাবার বোড়ে হিসাবে। এই মুহূর্তে বিশ্ব অর্থনীতির বাজারে রাজত্ব করছে ভারতের প্রতিবেশী দেশ চীন। সামরিক শক্তিও তার অপরিসীম। নিজ দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের দিক দিয়েও সে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে। স্বাভাবিকভাবেই তার সাথে পাল্লা দেওয়া ভারতের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। মঙ্গল অভিযানে চীন প্রাথমিকভাবে সফল হতে পারেনি। এখন ভারত যদি সে কাজে সফল হয়, তাহলে বিশ্ব বাজারে তার অন্ততঃ কিছুটা হলেও মুখ রক্ষা হয়। সবুজ সঙ্কেত সে জন্যেই।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসাবে স্বীকৃতিলাভের চেষ্টা বহুদিন থেকেই ভারত চালিয়ে আসছে। একই চেষ্টা চালাচ্ছে আর এক প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানও। উপগ্রহ নিক্ষেপ ছাড়া মহাকাশ গবেষণায় পাকিস্তানের তেমন কিছু সাফল্য জানা নেই। এমতাবস্থায় একটা সফল মঙ্গল অভিযান ভারতকে পাকিস্তানের থেকে কয়েক মাইল এগিয়ে দিতে পারে। সুতরাং দেশের নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সব কিছুকেই উপেক্ষা করেও সরকার এই অভিযানকে সবুজ সঙ্কেত দিয়েছে। অর্থাৎ এই অভিযান যতটা না 'বৈজ্ঞানিক', তার থেকেও অনেক বেশী 'রাজনৈতিক'। অমিত মেধা সম্পন্ন ভারতীয় বিজ্ঞানীদের প্রতি এ এক অপমান ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু তার জন্য এত অর্থব্যয়?

যে অর্থ ইতোমধ্যেই ব্যয় হয়ে গেছে, তাকে এখন আর ফিরিয়ে আনা যাবে না, কিন্তু দেশকে যে উচ্চ আসনে বসানোর স্বপ্ন নিয়ে ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ অভিযানকে সফল করে তুলেছেন, তাকে বাস্তবে রূপায়ণের দায়িত্ব তাই এখন দেশের রাজনীতিবিদদের নিতেই হবে। আমরা অধীর আগ্রহে এখন সে দিকেই তাকিয়ে রইলাম। □

উৎসর্গ মিত্র

নোবেল শান্তি পুরস্কার

কৈলাস সত্যার্থী ও মালালা ইউসুফজাই। একজন ভারতীয় অপরজন পাকিস্তানের নাগরিক। দু'জনেই এই উপমহাদেশের গর্ব। ২০১৪-র নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপক হিসেবে এই দু'জনকে নির্বাচন ক'রে ধর্ম, বয়স, লিঙ্গ ও জাতিসত্তার এক অভূতপূর্ব মেলবন্ধন ঘটালো নোবেল কমিটি। শুধু তাই নয়। এই পুরস্কারপ্রদানের মধ্য দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের দুই পরমাণু শক্তিধর প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে শান্তি ও সমঝোতার বার্তাও পাঠালো নোবেল কমিটি।

পুরস্কার প্রদানের পর নরওয়ের নোবেল কমিটির চেয়ারম্যান থরবির্ন ইয়াসল্যান্ড বলেন— "বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে ও শিক্ষার দাবিতে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ে এক হিন্দু ও এক মুসলিম, এক ভারতীয় ও এক পাকিস্তানিকে একসূত্রে বেঁধে ফেলার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে কমিটি।" দু'ই দেশের সীমান্তে নিরন্তর গোলাগুলির শব্দ। সাম্প্রতিক সময়ে কূটনৈতিক স্তরেও সম্পর্ক তিক্ত অবস্থায় রয়েছে। অশান্তির এই আবহের মধ্যেই শান্তির মঞ্চে একযোগে ঠাঁই পেল ভারত ও পাকিস্তান। এই দুই নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকের যোগসূত্র একটি জায়গাতেই— শিশুর অধিকার। শিক্ষার অধিকার।

এই দাবি উত্থাপন ক'রেই সাড়ে তিন দশক ধরে কাজ ক'রে চলেছেন ৬০ বছর বয়সী কৈলাস সত্যার্থী। তাঁর জন্মস্থান মধ্যপ্রদেশের বিদিশা। পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার এই মানুষটি সেই ১৯৮০ সাল থেকেই দিল্লি নিবাসী। সেই সময় থেকেই শুরু হয় তাঁর 'বচপন বাঁচাও আন্দোলন' সংস্থার কাজ। কৈলাসের উদ্ধার তালিকায় বর্তমানে ৮০,০০০ শিশু। শিশু শ্রমিক থেকে পথশিশু, স্কুলছুট থেকে পাচার হওয়া কিশোরী— বিভিন্ন অবস্থা থেকে তিনি এইসব শিশুদের উদ্ধার ক'রেছেন। ইতিপূর্বে বেশ কিছু বিদেশি পুরস্কার পেলেও কোনও বড় মাপের ভারতীয় খেতাব কিংবা সরকারী স্বীকৃতি তাঁর জোটেনি। পুরস্কার প্রাপ্তির পর কৈলাস বলেছেন— "নোবেল শান্তি পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় যদি মহাত্মা গান্ধীরও নাম থাকত, তাহলে আরও অনেক বেশি খুশি হতাম আমি।"

অকুতোভয় পাকিস্তানী কিশোরী মালালা ইউসুফজাইয়ের নাম গত দু'বছর ধরেই সম্ভাব্য পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় ঘোরাফেরা করছিল। পাকিস্তানের সেয়াট উপত্যকায় তালিবানি অত্যাচারের বিবরণ দিয়ে এগারো বছর বয়সে বিবিসি উর্দুতে তার ব্লগ লেখা শুরু। ফলশ্রুতিতে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তালিবানি হুমকি। ২০১২ সালের ৯ অক্টোবর স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে তালিবানি জঙ্গীরা স্কুলবাসে উঠে পড়ে। জঙ্গিদের প্রশ্ন ছিল— 'কে মালালা, না বললে বাসশুদ্ধ সবাইকে খতম করে দেব'। এই হুমকির নামে ভয়ে কুঁকড়ে না গিয়ে অকুতোভয় কিশোরীর জবাব ছিল— 'আমিই মালালা'। জবাব দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তালিবানি গুলি মেয়েটির মুখের একপাশ ফুঁড়ে চলে যায়। প্রথম ছ'দিন রাওয়ালপিণ্ডিতে এবং পরবর্তীতে ব্রিটেনের বার্মিংহামে চিকিৎসায় প্রাণে বেঁচে যায় সে। তারপর থেকেই দুনিয়াজোড়া খবর তাকে কেন্দ্র ক'রে। নোবেল প্রাপ্তির খবর যখন আসে, তখন সে বার্মিংহামের স্কুলে। এক সহপাঠিনী তাকে ডেকে নিয়ে পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটা দেয়। নোবেল পুরস্কারপ্রাপকদের তালিকায় ১৭ বছরের মালালাই সর্বকনিষ্ঠ। □

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।